কেরালার গল্পগুচ্ছ

॥ অনুবাদ ॥

বি. বিশ্বনাথম্

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর : ১৯৫৭

প্রচ্ছদপট

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী

প্রকাশক : শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মুদ্রাকর : শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উৎপল প্রেস, ১১০/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

॥ গল্পসূচী ॥

শহীদ কৃষ্ণ পিল্লাই স্মরণে

॥ ভূমিকা ॥

'কেরালার গল্পগুচ্ছ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

কেরালা বাংলার মতই ভাত-মাছ-তেলের দেশ। আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়েও তাকে দক্ষিণ ভারতের 'কাশ্মীর' বললে মোটেই অতিরঞ্জণ হবে না। নৃত্যনাট্যে কেরালার 'কথাকলি' ভারত তথা বিশ্বের দরবারে সুনাম অর্জন করেছে। এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে কেরালা সম্পর্কে বাংলা দেশের মানুষ খুব কমই জানেন। ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও আমাদের এই দুই অঞ্চলের মানুষের করণীয় সম্পর্কে অবহেলা ছোট করে দেখা চলে না। এই পবিত্র উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন সময়ে দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যকে বাঙলায় তুলে ধরার প্রয়াস পাই।

'কেরালার গল্পগুচ্ছ'র দ্বিতীয় সংস্করণ আত্মপ্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে গল্পের মূল লেখকদের কেরালার 'নবযুগম' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এবং স্থানীয়ভাবে সাহায্যকারী সর্বশ্রী রাখালদাস চক্রবর্তী, সুরেন দত্ত, ধনপতি বসু, গণেশ সাউ ও অণু দাসের নাম সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করছি। প্রসঙ্গত গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহালয়া, ১৩৬৪।

বি. বিশ্বনাথম্

আমি বেঁচে আছি কেন

এস. কে. পোট্টেক্কাট

দাদা মণি গো,

তোমাকে এখনো দাদা বলে সম্বোধন করার সাহস তো হারাই নি, কারণ সাধারণের ঘৃণিত পতিতার জন্য তার আদরের দাদাকে ডাকতে অন্য কোন নাম তো সমাজের আইন-কানুন বেঁধে দেয়নি।

গত কালকের ঘটনাটি হতে পারে অপ্রত্যাশিত—আকস্মিক একটি ঘটনা। হতে পারে বহু প্রত্যাশিত হারানো আত্মার আকস্মিক সাক্ষাৎ, যে সাক্ষাৎ সহজ ও সরল করে বুঝিয়ে দিতে পারে কেমন করে একই জগদ্দল পাথর মনুষ্যত্ব-শৌর্য-বীর্যে স্ফীতবক্ষ কোটি কোটি মানুষকে পিষতে পিষতে একই পরিণতির চূর্ণ অস্থিতে পরিণত করে থাকে। আবার এ ঘটনা এমন ঘূর্ণিচক্রও হতে পারে, যা শান্ত, স্তব্ধ, মৃতের ন্যায় নিশ্চল হৃদয়-সমুদ্রে তুলে দিতে পারে প্রলয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী তরঙ্গমালা, আবার এনে দিতে পারে অসার স্নায়ুতে সুচঞ্চল স্পন্দন।

'চিন্তা করবার সময় এসেছে।' বিছানায় শোয়া এক পতিতা ভাবতে লাগল, 'আমার সঙ্গিনীরা, অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে'।

এই নতুন প্রভাতে কোন এক লম্পটের হারিয়ে যাওয়া নোটবুকের কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এক ভাঙা কলম দিয়ে

তাই লিখতে বসেছি। নিজে যা ভাবতে পারছি, তাই লিখে চলেছি।

হ্যাঁ, দাদা, সত্যিই এখন দুনিয়ার সকলের ঘৃণার পাত্রী আমি। আমি এক পতিতা। সমাজের সকলে আমায় মনে করে নরকের দ্বার। জীবনের পচা নর্দমায় ডুবে গিয়ে এমন এক পোকায় পরিণত হয়েছি যে, সুখ-দুঃখকে চিনে নিতে পারছি না। বুঝে উঠতে পারছি না, যে স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর আলোক থেকে কেমন করে এই দুর্গন্ধময় আঁধার-ঘন গলিপথের নর্দমায় এসে পড়েছি অথবা নিক্ষিপ্ত হয়েছি। না, না, এখানে আসার কল্পনা বা চিন্তা আমার অবচেতন মনেও তো কোনদিন স্থান পায় নি। তবে? তবে কি সমাজের ঐ সুদক্ষ অদৃশ্যহস্তই সমান তালে ঠেলতে ঠেলতে দুর্গন্ধময় নর্দমা প্রবাহে এমন দক্ষতার সঙ্গে নামিয়ে দিয়েছে, যে আমার মত নিরীহ জীব টের পাবার অবকাশ পর্যন্ত পায় নি। এখন কিন্তু বুঝতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না যে, আমাকে দিয়ে নরক সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়!

তুমি বোধ হয় আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছো। তোমার মধ্যে অতীতের কয়েকটি স্মৃতি জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছি। আর সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সেই পুষ্প-পবিত্র বালিকার জীবনে দেখতে দেখতে কেমন করে নেমে এলো পতিতা-বৃত্তি, সেই ছবি আঁকার জন্য টেনে যাচ্ছি কয়েকটি রেখা।

আমার জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। দুরাত্মীয় কোনো এক বুড়ি-দিদিমা বড় করলেন আমাকে। তাঁর চেহারা আমার চোখের সামনে আজ আর

স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে পারছে না। ষোল বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর। তুমি ছিলে তখন ষোল বছরের কাছাকাছি বয়সের এক কিশোর।

পুষ্পখচিত কেশগুচ্ছে ও কাজল-টানা দীপ্ত নেত্রে উৎফুল্ল হরিণ শিশুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে যেতাম বিদ্যালয়ে আর তুমি কৈশোরের চঞ্চল হস্তে পথের ধারের আম গাছগুলোতে ছুঁড়তে ঢিল। সে ছবি এখনো আমার কাছে জীবন্ত হয়েই আছে। মাঝে মাঝে অন্যান্য ছেলেদের ডেকে নিয়ে আরম্ভ করে দিতে গাদি খেলতে। আবার কখনো কখনো বইগুলো জামার তলায় গুঁজে নিয়ে তুমি যখন আম পাড়বার জন্যে লাফিয়ে উঠতে গাছে আমিই তখন পাহারা দিতাম গাছের তলায় কেউ তাড়া করে আসে কিনা দেখবার জন্যে। এই রকমে একদিন আমি যখন নিচে আম গুনছিলাম, ঝুপ করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েই আম কাটবার সময় তুমি আমার বাঁ হাতের একটা আঙুলই তখন কেটে ফেললে। আমি হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম। তোমার লাঞ্ছনা, অবমাননা যেন আমাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতো। তাই একদিন শিক্ষক মশাই আঙুল কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোঁজামিল দিয়ে কি একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতেই সকলে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। সেদিনের কথা কি আমি ভুলতে পারি? মাঝে মাঝে তুমি আমাকে মারতে, খ্যাপাতে, আর আমি যখন জল-ভরা দুটি চোখ নিয়ে ঠোঁট উল্টে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতাম, তখন তুমি আমাকে দেখেও যেন কোনো তোয়াক্কা না করে না দেখার ভান করে

চলে যেতে। পরে আবার তোমার পিঠে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলতে, আদরও করতে। শৈশবের সেই সমস্ত দৃশ্যগুলি দিনের আলোর মত আজও আমার কাছে পরিষ্কার। কত সুন্দর ছিল সেই শৈশব! কত পবিত্র ছিল সেই জীবন! আজ মনে হয় যেন সে এক পরীরাজ্যের অপরূপ কল্পনা।

একদিন রাত্রে আমি পড়ছি। পরীক্ষার দুচার দিন মাত্র বাকী। তুমিও রাত জেগে পড়াচ্ছো আমাকে। ধোঁয়াটে চিমনীর ভেতর দিয়ে আবছা আলোকে-ভেসে-আসা তোমার সেই গাম্ভীর্যময় মুখ আজও যেন দেখতে পাচ্ছি, দাদা।

আমি পাস করে গেলাম। তুমিও দশম শ্রেণীতে উঠলে। আমি জীবনের পথে এক এক ইঞ্চি করে এগিয়ে দেখতাম, জীবনের রূঢ় বাস্তবের অন্ধকূপে এক এক গজ করে ডুবে যাচ্ছি।

বাবার মাইনে খুব কম ছিলো। ফলে আমাদের দুজনের পড়াশুনার খরচ চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হলো আমাকে। পড়ার ইচ্ছা আমার মনের আনাচে কানাচে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও আমাকে বাধ্য হয়েই সেই ইচ্ছাকে দমিয়ে দিতে হয়েছিলো। এরজন্যে একটুও দুঃখ পাইনি।

তিনটি বছর কেটে গেল। দু দুবার তুমি পাস করতে পারলে না। তৃতীয়বারে বৈতরণী পার হয়ে আদা জল খেয়ে বেরিয়ে পড়লে চাকরী খুঁজতে। দুবছর হাঁটাহাঁটি করেও কোন ফল হলো না। তোমার মন গেল দমে। অবশেষে তুমি ঠিক করে ফেললে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেইদিন থেকেই তোমার

মধ্যে এসেছে বড় রকমের এক পরিবর্তন। একদিকে জীবন তোমার কাছে হয়ে উঠলো দুঃসহ। অন্যদিকে ঘরছাড়ার বেদনা হৃদয়ে মারছিলো তীব্র কশাঘাত। এই দু'য়ের পেষণে তুমি হচ্ছিলে নিষ্পেষিত। অবশেষে আমার এক গহনামাত্র সম্বল করে তুমি বেরিয়ে পড়লে।

তোমাকে হারিয়ে যে ব্যথা পেয়েছিলাম, তা মনে করতেই বুক ভেঙে পড়তো আমার জীবনের এক একটা বিরাট অংশ। বুড়ো বাবাও পেলেন এক নিদারুণ আঘাত।

যুবতী মেয়ে ঘরে থাকা যে কোন গরীব বাবার যে কী বিরাট এক পর্বতপ্রমাণ দুঃখের কারণ, তা একমাত্র মেয়ের বাবা না হলে হয়তো অনুভব করা সহজ নয়। মনের মত বরের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করার ইচ্ছা যে আমার একেবারে ছিল না, তা নয়। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ করার মত কোন বর তো এগিয়ে আসে নি! ধনীদের পরিবারে সুন্দরী যুবতীরা ভগবানের আশীর্বাদ, আর গরীবের ঘরে যেন এক ভয়াবহ অভিশাপ। আকারে ইঙ্গিতে পাড়ার অনেকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলো। যাদের সামর্থ্য নেই অথচ শখ আছে তাদের জঘন্যতম লালসা মেটানোর জন্যে নিজেকে কোনক্রমেই সমর্পণ করতে চাইতাম না। ফলে ভেতরে ভেতরে অনেকেই শত্রু হলো।

বিপদ যখন আসে তখন চারিদিক থেকেই কাল-বোশেখীর মেঘের মত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এসে বিপর্যস্ত করে তোলে নির্মল আকাশকে। প্রকৃতির সংহার মূর্তি মানুষের মনে তখনি এনে দেয় চরম বিভীষিকা, তখনই শুরু হয় বজ্রপাত। দুঃখকষ্টের

জীবনে নিষ্ঠুর পরিণতি সম্পূর্ণতা লাভ করলো তখন, যখন বাবার চাকরীজীবনে নেমে এলো ভয়াবহ ছাঁটাই। দুমুঠো ভাতের জন্যে আমাদের ছটফটানি আরম্ভ হয়ে গেল। যে কোনভাবে ঠেলেঠুলে ছ'টি মাস কাটলো। বিপদের পর বিপদ হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো আমাদের জীবনে। বাবা পড়লেন অসুখে। অসুখটা বেড়েই যেতে লাগলো। ওষুধ কেনার জন্যে কানাকড়িও বাড়িতে ছিল না। ছোটখাটো গহনাগাঁটি আগেই বন্ধক রেখেছিলাম। থালাবাসনগুলোও লোপাট হয়ে গেল। অবশেষে বাড়িটাও বন্ধক রেখে দিতে বাধ্য হলাম। বাবার অসুখ কমবার নামও করছিলো না। তাঁর ক্ষুধা যেন দিনে দিনে বেড়েই যেতে লাগলো। "যাই খাই না কেন, যতই খাই না কেন, ক্ষিদে! ভীষণ ক্ষিদে পাচ্ছে, মা। মা, মাগো খেতে দে, ক্ষিদে পাচ্ছে, খেতে দে"—এই ছিলো বাবার সারাদিনের কান্না আর কান্না। কিন্তু খাবার যে কোত্থেকে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে তাঁর কোন চিন্তা ছিলো না। আমিই বা কোথায় পাবো? অবশেষে পাশের গাঁয়ের স্কুল-সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে সব দুঃখের কথা বললাম। তার স্কুলে মাস্টারী নেওয়ার জন্য তাকে আবেদন করলাম। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বি-টি পাস করেছো?'

'আজ্ঞে, না' আমি বললাম—'ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি। আপনার স্কুলের যে কোন ক্লাসে পড়াতে পারবো।'

'না, বি-টি ছাড়া কাউকে নেওয়া হবে না—' খুব নিষ্ঠুর স্বরে তিনি বললেন। আমার শরীরটা সঙ্কুচিত হতে লাগলো

তিনি একনজরে তা লক্ষ্য করে খানিকক্ষণ পরে বললেন, ‘কাল এসো, আমি ভেবে চিন্তে বলবো।’

সামান্য আশা নিয়ে আমি ফিরে গেলাম। কথামত আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম। তার চেহারা দেখেই কেন যেন আমার ঘৃণা হতে লাগলো। সেই ঘৃণাকে ফুটিয়ে না তুলে আমি তার সামনে দাঁড়ালাম। তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর ভেতরে আমি যেন তার পাশবিক হৃদয়বৃত্তির একটা ছবি দেখতে পেলাম। তারপর সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি আমাকে একটা চাকরী দিলেন। কিন্তু দাদা, তাতে আমাদের ক্ষুধা মিটলো না। মাইনে চাইলে বলতেন ‘অপেক্ষা কর, গ্র্যাণ্ট আসুক।’

একদিন তার কাছে গিয়ে অন্তত কিছু টাকা দেওয়ার জন্যে আবেদন করলাম।

‘এখন তো আমার কাছে কিছুই নেই’—তিনি বলে উঠতেই আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সেদিনের মত আজও তিনি মুচকি হেসে উঠলেন কালো দাঁত বের করে।

‘আচ্ছা, যে কোনভাবে জোগাড় করে রাত্রে অবশ্যই আসবো’, তিনি বললেন। শেষের কথা কয়টি আস্তে আস্তে বললেও আমি তার শয়তানি ইঙ্গিতটা টের পেয়েছিলাম। তার চাহনি আর কথাবার্তা আমার মধ্যে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করলো। তখনকারমতো কিছু না বলেই আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

সেদিন রাত্রে আমার একটুও ঘুম পায় নি। জীবনের এই প্রথম আমার ভয়ঙ্করভাবে রাত্রি কাটলো। অর্ধেক রাত

কেটে গেছলো। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। জানলা দিয়ে আমার বিছানার ওপর টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'জানকী, জানকী' বলে চাপা গলায় কয়েকটা ডাক ভেসে এলো। সেই আওয়াজ পঙ্কিল নগ্নতাকে যেন আমার সামনে তুলে ধরলো। বিছানায় মুখ লুকিয়ে একই ভাবে শুয়ে রইলাম। সেই লম্পটের কদাকার মুখটা আর একবার জানলা দিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

'এখন আমার কী করা উচিত', এই একই প্রশ্ন আমার মনের কাছে করে চলেছি কত শতবার।

নিজের চরিত্র আর নিষ্কলঙ্ক নামকে কিছুতেই কালিমালিপ্ত না করবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে। পরক্ষণেই 'মা, খেতে দে মা, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে মা।' বাবার এই কান্না থেকে থেকে কানে প্রবেশ করছিলো। ঘরে একদানাও চাল নেই। আমাকে সাহায্য করার মত এ ছুনিয়ায় কেউ নেই। আমার কাছ থেকে পুরোমাত্রায় খাটুনি আদায় করে সৌন্দর্য প্রভৃতি আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তা চুরি না করে রুটি দেওয়ার মত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজ আজও তো গড়ে ওঠে নি।

সেই টর্চ থেকে আর একবার এক ঝলক আলো ছিটকে এলো। কাঁপা কাঁপা স্বরে সে আর একবার ডাকলো আমাকে। ছুই চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছিল। বালিশ ভিজে গেছলো। বুকটা যেন টিপ্ টিপ্ করে উঠলো। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম, যাতে ফোঁপানোর আওয়াজ

শুনতে না পায়। আরও কিছুক্ষণ কাটলো, সে পিশাচও ফিরে গেল।

কিন্তু দাদা, সমাজের বদনাম, তিরস্কার এমন কি ভগবানের চেয়েও ভয় পাওয়ার মত একটা জিনিস আছে, সেটা হলো ক্ষুধা। এমন কেউ নেই যে তার কাছে অহরহ মাথা নোয়াতে বাধ্য নয়। সেজন্যে আমাকেও মাথাটি নুইয়ে দিতে হলো সেই সেক্রেটারীর কাছে।

তারপরের কাহিনী আর বোন হয়ে বলতে পারছি না। তবে বিদ্যায়তনে যদি সরস্বতী থাকতো, বীণার ঝঙ্কারেই উঠে পড়তো প্রতিবাদের ঝড়। কিন্তু সেটা তো বিদ্যাদানের কেন্দ্র নয়, সেটা ছিল বিদ্যাব্যবসায়ের কেন্দ্র।

অন্তত একটা ব্যাপারে আমার মন তৃপ্ত হলো। বাবাকে খাওয়ানোর মতো টাকার অভাব আমার হতো না। বাবা পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর শরীরে ভাঙন ধরলো—কী এক ভয়ঙ্কর বিশ্রী রূপ।

একমাস এইভাবে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে অবশেষে আমাদের এ অবাক পৃথিবীকে সেলাম জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

একা একা থাকাটা আমার কাছে ভয়ঙ্কর বোধ হতে লাগলো। আর তা ছাড়া আমি যে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলাম! বাবার মৃত্যুর পরেই আমাদের বাড়িটা মহাজনের কবলে পড়ে গেল। ছাড়ানোর মত ইচ্ছা থাকলেও সামর্থে কুলোল না। লোকে যদি জানতে পারে আমি গর্ভবতী, তাতে আমার ভয় বা

অপমান বোধ হতো না। মর্মান্তিক যে সেই জায়গাটিতে, যেখানে সম্ভ্রমওয়ালা, সম্ভ্রান্তবংশীয় বড় বাবুরা জলজ্যান্ত সত্যকে চেপে গিয়ে করে বসে অস্বীকার। তারা নাকি টাকা দিয়েই বন্ধ করে দিতে পারে সব কিছুর মুখ। আর দিলোও তো তাই করে। আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে আর একটা ঘর ভাড়া নিলাম।

প্রসবের দিন ঘনিয়ে এলো। কাছে একটি কানাকড়িও ছিল না। অবশেষে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের শরণাপন্ন হলাম।

যে শিশুর আমার কোন প্রয়োজনই ছিল না, সে শিশু হয়েই মারা গেল। আমাকেও বেরিয়ে পড়তে হলো পথে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মনে হলো কেউ আমার পিছু নিয়েছে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, এক যুবক অতি সন্তর্পণে ইশারায় আমন্ত্রণ করছে। হয়তো ওকে আমি হাসপাতালে দেখেছি বলে মনে হলো। ডুবন্তলোকের সামনে খড়ের সাহায্য। সাহসে বুক বেঁধে গেলাম তার কাছে। এক নির্জন জায়গায় যাওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো ?' মনে হলো যেন সে আমার অবস্থা জেনেশুনেই জিজ্ঞেস করছে, 'সঙ্গে এলে কারখানার কাজে ঢুকিয়ে দেবো। আসবে ?' জিজ্ঞেস করলো। তার সঙ্গে শহরে গেলাম।

'জানকী, তোমার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। কোথাও দিন দশেক থেকে স্বাস্থ্য ঠিক করে নাও। জান তো স্বাস্থ্যই হচ্ছে সম্পদ', সে যুবকটি দরদমাখা ভাষায় আমাকে বলে।

দ্বিতীয় দিন আমাকে কোন বুড়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে

তাকে বললো, 'দিদিমা, এ বেচারী কিছুদিন এখানেই থাকবে। দিনদশেক পরে একে নিয়ে যাবো। ততোদিন যা ওর মন চায় তা দিয়ো। কাল পরশু নাগাদ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবো।'—এই কথা বলে সে চলে গেল।

দিদিমা আমাকে নতুন পোশাক দিল, সময়মতো খেতে দিল প্রচুর, আর দেহে যাতে লাবণ্য আসে, মুখে যাতে প্রফুল্লতা আসে তার জন্যে ওষুধপত্তর দিতেও ভোলে নি। নিজের মেয়ের মত আমাকে ভালবেসে দেখাশুনা করলো। কিন্তু দিনদশেক তো দূরের কথা পনেরো দিন পরেও যুবকটি আর এলো না। দিদিমার রূপ বদলে গেল। পনেরো দিনের ঔষধ ও খাওয়া খরচ বাবদ চেয়ে বসলো ষাট টাকা। আমি বললাম, 'তাকে আসতে দাও।'

দিদিমা উত্তর দিল, 'সে আর আসবে না।'

তারপর একে একে সব খুলে বললে যে সে পতিতাদের মালিক। আমি ছাড়া আর চারজন পতিতা আছে। আমার জন্যে যে টাকা খরচ করেছে তা আমাকেই শোধ করতে হবে। ধৈর্য ধরে আমি তার সব কথা শুনলাম। ঠিক করে ফেললাম যে, যখন জন্মেছি তখন কোন-না-কোন-ভাবে বাঁচতেই হবে। সে ঐ পেশার প্রাথমিক শিক্ষা আমাকে দিল। প্রথমে কোন স্ত্রীলোক পতিতার জীবন যাপন করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। নারীজীবনের কৌস্তুভরত্ন নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্বকে বিসর্জন দিয়ে কোনও নারী ঐ পথে পা বাড়াতে কি চায় দাদা? পতিতার বাহ্যিক সাজসজ্জা

আর ঠোঁটের কোণের হাসির অন্তরালে আমাদের এই নিদারুণ নগ্নজীবনের দিকে একবারও কি কেউ দৃষ্টিপাত করে? কত কদাকার, কত মাতাল আর কত বিশ্রী ধরণের লোক যে এখানে আসে, তার ইয়ত্তা নেই। এইসব জঘন্য প্রকৃতির লোকের সামনে আমাকে.........। এটাই আমার পেশা!

প্রথম প্রথম অন্যান্য নবাগতাদের মত আমিও জড়সড় হয়ে যেতাম, ঘৃণা করতাম। গা গুলিয়ে যেত। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে আমার চেতনা ও অনুভূতি যেন তত দ্রুত লোপ পেয়ে যায়। মনের তাগিদ বলে কিছুই রইলো না। সবসময় ঐসব লোকের চাহিদাটাই পেত প্রাধান্য। ওরা আমাকে খেয়াল-খুশিমত নাচাতো। নাচতে হত তাদের তালে তালে। দাদা, দেড় বছর ধরে আমার জীবন এই মরুভূমিতেই এগোচ্ছে। ওয়েসিস এখানে নেই!

কাল রাত্রে! অন্যান্য দিনের মত ঐ ধরণের একজন কামলোলুপ লোকের প্রতীক্ষায় বসে আছি! তখন কেউ আসে নি। মাঝে মাঝে গায়ে পাউডার মাখছি। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছি। আরও ফুল চুলে গুঁজে নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে সোফায় বসে আছি।

সময় কেটে যাচ্ছে। নিচে মোটর গাড়ির যাতায়াতের শব্দ ক্রমশঃ কমে গেছে। পাশের ঘরে আমার সঙ্গিনী শিকার পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই চাকরানী এসে বলে গেলো, 'এসেছে।' কোন একজন লোক আমার ঘরে ঢুকলো। নববধূদের মত

লজ্জাবতী লতা হয়ে আমি মাথা নীচু করে জড়সড় হয়ে বসেছি। লোকটা কাছে এসে এক হাতে আমার ডান হাত চেপে ধরে অন্য হাতে ঘোমটা তুললো। এক সলজ্জ ও চটকদার ভঙ্গিমায় আমি তাকাই তার দিকে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি! আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি! আমার জংধরা মনের প্রতিটি তন্ত্রীতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লাগলো। তুমি আমাকে ঘুরে দেখে পাংশুটে মুখে মুহূর্তকাল কী যেন ভাবতে লাগলে। তোমার নজর পড়লো আমার কাটা আঙুলের উপর। ব্যস্, যেটুকু দ্বিধা ছিল তা দূর হয়ে গেল! আমিই তোমার সেই বোন, জানকী। তুমি ছুটে বেরিয়ে পড়লে। তোমার পকেট থেকে পড়ে গেল কয়েকটি কাগজ।

ছটি বছর পরে ভাগ্যের জোরে নয়, ঘটনার সংঘাতে ভাইবোনের দেখা-সাক্ষাৎ হলো এই ভাবে, দাদা!

পাঁচটা বাজে। চাকরানী স্নান করতে ডাকছে। স্নান করে চোখে সুরমা পরতে হবে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে হবে। সেজেগুজে জানলার কাছে - অপরিচিত আত্মীয়দের প্রতীক্ষায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এটা লেখার পর শান্তি পেয়েছি। কিন্তু আমার জীবনের সামনে দিগন্তের আলো এখনো ফুটে ওঠেনি। ঘুণাক্ষরেও ভেবোনা যে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এই চিঠির মাধ্যমে তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ভুলেও যেন কোনদিন মাড়িয়োনা এই পথ।

এ পেশা থেকে বর্তমানে আমার কোন অভাব হচ্ছে না। কিন্তু কিছুদিন পরে মুখে কালো কালো কুৎসিত দাগ পড়বে।

গণিকা-জীবনের লেবেলগুলো ফুটবে দিনের আলোয়। শরীরটা ভেতরে ভেতরে ফুলে যাবে। সেদিন আমি নোটিস পাব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। এই অট্টালিকা থেকে নেবে যেতে হবে ফুটপাতে। তার দুচার দিন পরে শরীরটা পচতে শুরু করবে। সমাজ আজকের অবস্থার মধ্যেই পড়ে থাকলে কোনও হাসপাতালের পরিবর্তে ফুটপাতেই পড়ে থাকতে হবে। অবশেষে ঐসব কুৎসিৎ রোগের বীজাণু ছড়াতে ছড়াতে হাত পেতে অবাক পৃথিবীর কাছে শেষ আবেদন জানাতে হবে একটি পয়সার জন্যে। কালোরাত্রির অনেক পরিচিত লোক পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। সেদিন, দাদা, তোমার সঙ্গে আবার যেন তোমার বোনের দেখা হয়!

ইতি—
তোমার বোন
জানকী

একের পর এক

এম. গোবিন্দন্

'কুঞ্জম্মদ'।

'উঁ……।'

'দেখ দেখি সমুদ্রটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ সত্যি সুন্দর।'—অস্থির শিশুদের মত খেলায় মত্ত নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জম্মদ বলে। 'সমুদ্রের ওপারে কি আছে?'—আবার আসে প্রশ্ন।

'দ্বীপের পরে?'

'দ্বীপের পরে?……দ্বীপের পরে?'

কুঞ্জম্মদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর বলে, 'আরও কত কি আছে।'

'তারপরে?'

'জানিনে যাও।' কুঞ্জম্মদ রেগে বলে, 'তারপর আর কিছু নেই।'

পাত্তুর মনে অস্বস্তির আভা। তার ডাগর ডাগর চোখে অজানার আকুলিবিকুলি।

'আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে?'

'আচ্ছা নিয়ে যাবো'খন।'

কুঞ্জম্মদের বয়স নয় বছর আর পাত্তুর বয়স শুধু সাত। দুজনেই সমুদ্রের তীরে যায় ঝিনুক কুড়োতে। সেখান থেকে কিছুদূরে আছে অনেকগুলো ছোট ছোট কুঁড়েঘর, যেন মুরগীর খোপ। সেগুলোতেই তারা থাকে—পাত্তু, কুঞ্জম্মদ এবং তার মত আরও কতো জেলের ছেলেমেয়েরা। ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিন শুরু, রাত্রে সূর্য ডোবার পর দিনের পরিসমাপ্তি। তার পরেই রাত। এদের জীবন অদ্ভুত বিচিত্র ধরনের। মাছের মতই এরা দিনের অর্ধেক সময় কাটায় জলে। বাকীটা ডাঙায়। তাদের দুনিয়ায় আছে উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড়, আর ছোট ছোট নৌকা আর ছোট বড় জাল।

একের পর এক হাজার হাজার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে সমুদ্রের তীরে, ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙেচুরে সে ঢেউ মিলিয়ে যায় আবার সমুদ্রের বুকে....

ঐ মাঝিরাও সমুদ্রে ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে মহাকালের সমুদ্রের বুকে একের পর এক মিলিয়ে যায়। পাত্তু আর কুঞ্জম্মদ ওদেরই ঘরের দু'টি শিশু। ওদের কচি মন আর কাঁচা দেহ সমুদ্রতীরের অনাদৃত আবহাওয়ায় পুষ্ট হতে থাকে। আসে কৈশোর।

'দ্যাখ পাত্তু, তুই এখন আর সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটি নোস, বুঝলি?' একদিন মা পাত্তুকে বলে। মায়ের কথা সে গ্রাহ্য করে না। কুঞ্জম্মদের সঙ্গে সে সবসময় খেলা করতে চায়, তাকে আটকে রাখার সহজ উপায় খুঁজে না পেয়ে মা ঐ কথা বলে।

পাত্তু ভাবে, তাহলে তো তার কুঞ্জম্মদও বাচ্চা ছেলেটি আর নেই। শিশুদের চিন্তাভাবনা বড়রা কতটুকুইবা বুঝতে পারে!

বাবা,-মা একদিক দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিক দিয়ে কুঞ্জম্মদের খোঁজে বেরোয় পাত্তু। সে নিশ্চয় আশেপাশে আছে। কোন-না-কোন নারকেল গাছের আড়ালে। এমনি-ভাবে কেটে চলে সময়। সমস্ত বিশ্বের বিস্ময় অসীম সমুদ্র। তাইতো শৈশবে পাত্তু জানতে চেয়েছিলো সমুদ্রের অসীমতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জগৎকে। আর আজ যেন হু'জনের কাছেই মনে হয় আরও গভীর, আরও রহস্যময় এবং আরও অসীম কিছু লুকিয়ে আছে তাদের নিজেদেরই মধ্যে। ওরা অজ্ঞাত কোনও একদিন থেকে একে অপরকে জানার চেষ্টায় ব্যাপৃত। আর কি আশ্চর্য—সেইদিন থেকেই কেমন একটা সঙ্কোচের জড়তা অনেকক্ষেত্রে তাদের মেলামেশার সাবলীলতাকে লজ্জারূপ পর্দা দিয়ে আধো আড়াল করে দিয়েছে। এখন ওরা উভয়ে উভয়ের দিকে বেশীক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাতে পারে না। চোখের পাতা আপনিই নত হয়ে আসে।

একদিনের কথা। পাত্তুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জম্মদের দৃষ্টি আর দেহ লীন হয়ে যায়, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তার অনেক কথা আছে বলার। চোখ হুটোকে সে আরও ছড়িয়ে দেয় দিগন্তে। লজ্জা তাকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। সে আবার সোজাসুজি একদৃষ্টে তাকায় পাত্তুর দিকে। মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করে পাত্তু। লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলে— 'ধ্যাৎ, ঐ দেখো দেখি পাখিটির দিকে।'—সে কুঞ্জম্মদের মন

অন্তদিকে টেনে নিয়ে হরিণ শিশুর মত লাফিয়ে ছোট্ট এক ঝোপে লুকিয়ে পড়ে।

কুঞ্জম্মদ মোটেই নড়লো না। সে নিস্তব্ধ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুটা লজ্জা পেলো, রাগও তার হলো কিছু।

'এই পাত্তু, এদিকে আয়, শোন।'

'কি ?—বল।'

'একটু এদিকে আয় না।'

সে বেরিয়ে এলো। তার যৌবন পূর্ণতার মুখে। কিন্তু কুঞ্জম্মদের কাছে যেন সে আজও সেই সাত বছরের বোকা মেয়েটি।

'আরে বল না, তোর মত আছে?' কুঞ্জম্মদ জিজ্ঞাসা করে।

'কি'—সেই বোকা প্রশ্ন।

'কি তোর ইচ্ছা আছে ? বল না।'

'কিসের ?'

'আমি বিয়ে করতে চাই।'

'বেশতো, কাকে ?'

'তোকে'—সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে মুখ খুলে হঠাৎ বলে ফেলে।

'উঁহুঁ, এখন নয়। এখন তোমাকে বিয়ে করার মত আর্থিক অবস্থা কি আছে ?'

'তাতো নেই।'

'নেই তো ?—তবে ?'

সে আরো কিছু বলতে চাইল। কিন্তু হঠাৎ বলতে না পেরে মুখ নিচু করে ছুটে চলে গেলো নিজের কুঁড়ে ঘরে। তার মনে হল কেউ যেন তাকে প্রচণ্ড একটা চাপড় মেরেছে। সে তাকে অন্তরের ভালবাসা দিয়েছে কিন্তু……

সেদিন পাত্তুরও শরীর মন বিগড়ে ছিল।

পরদিন পাত্তু জল তুলতে পাতকুয়োর কাছে যায়। কুঞ্জম্মদের মা পথে ভারীগলায় তাকে জিজ্ঞাসা করে—'পাত্তু, কুঞ্জম্মদ কোথায় গেছে কিছু জানো? কত যে খুঁজছি কোন পাত্তাই মিলছে না।'

পাত্তুর মনটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চমকে ওঠে। তার সত্তার উপর একটা অবশতা ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে কি…! তার চোখ ফেটে যেন জল ছিটকে বেরোতে চায়। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকীমা সে কোথায় গেছে, কবে ফিরবে তার কিছুই কি তোমাদের বলে যায়নি?'

'না—মা,—কিছুই না!'

গোধূলি বেলায় সমুদ্রের ধারে যায় পাত্তু। সেখানেই তারা খেলা করত অতীতে। গামছা বিছিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নামাজ পড়তে শুরু করে দেয়।

দিনের পর দিন যোগ করে সপ্তাহ-মাস-বছর কেটে গেল। কিন্তু তখনও কুঞ্জম্মদ ফেরেনি। তার মা প্রতিটি দিন পাঁচবার করে নামাজ পড়ে, 'হে আল্লা আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনো।

এই ছেলেমেয়ে দুটিকে এক করে দাও, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

একদিন পাতকুয়োর জল তুলছিল পাত্তু। তার পেছনে সুন্দর পোশাক-পরা বড় বড় মোছওয়ালা এক নওজোয়ান হঠাৎ এসে দাঁড়াল। প্রথমটা সে ভয় পেয়ে হাতের দড়িটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লোকটির মুখের দিকে চেয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আকস্মিক আনন্দের আবেশে দেহ মন তার শিথিল হয়ে এলো। চমক ভেঙে শুধু বললে—'তুমি'! চোখের কোণেও বুঝিবা কিছুটা আবেগের উচ্ছ্বাস জমেছিলো, না হলে পারিপার্শ্বিকতার উপর একটা ঝাপসা আবরণ পড়বে কেন?

'কি পাত্তু! তুই আমাকে চিনতে পারিসনি!' জিজ্ঞাসা করে কুঞ্জম্মদ। চিনেছে ঠিকই কিন্তু তা প্রকাশের ভাষা হারিয়ে গেছে।

'কি হলো মা?'—পাত্তুর মা জিজ্ঞাসা করতে করতে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

'মা……মা……আমি যে……সে। ও! সে উধাও হয়ে গেছে।' বুড়ির ঠোঁটে হালকা হাসির ছোঁয়া। গলার আওয়াজেই বুড়ি বুঝে নিয়েছে 'সে'-টা কে!

'কিন্তু ছেলেটা এসেই পালালো কোথায়। ডাকনা তাকে।' বলে বুড়ি। আবার নিজের কাজে খুশীমনে লেগে যায়।

'তুমি আমাকে ভুলে গেছো পাত্তু?'

'না তো, ভুলবো কেন?'—উত্তর দিতে গিয়ে আনন্দ ও

বেদনামিশ্রিত এক অপূর্ব অনুভূতি তার মনকে আচ্ছন্ন করলো। কুঞ্জম্মদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। হ্যাঁ, সত্যি তার হারিয়ে যাওয়া কুঞ্জম্মদকে সে আবার ফিরে পেয়েছে। কিন্তু আবার কিছুদিনের জন্য কুঞ্জম্মদ চলে যাবে ভাবতে পাত্তুর ভারী খারাপ লাগে।

'দেখ পাত্তু তোকে বেশ জোর গলায় বলে দিচ্ছি, পরের বার যখন আসব তখন আর কুঞ্জম্মদ হয়ে আসব না, আসব বর হয়ে। বুঝলি?'

সলজ্জভাবে পাত্তু বলে—'বুঝেছি মশায়, বুঝেছি, রাজ্য জয় করতে যাচ্ছো, একটি রাজকন্যাকেও সঙ্গে করে আনবে। সেরকম কেউ চোখে পড়ে গেলে আমাকে কি আর মনে পড়বে।'

'আমি যে রাজ্য জয় করবো সেখানে রাজকুমারী হচ্ছে পাত্তুরানী'—এই বলে মুচকি হেসে রাজ্যজয়ী বীরের মতই কুঞ্জম্মদ বুক টান করে চলে যায়।

দু' বাড়ির দুই গিন্নির ঘটকালিতে কর্তারা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। হবে নাইবা কেন? তাদের সমাজের মূল্য-বিচারে পাত্র পাত্রী কেউইতো অনুপযুক্ত নয়।

কুঞ্জম্মদ ফেরার আগেই ব্যবস্থা প্রায় পাকপাকি হয়ে থাকে। ওদের দুজনের মনোভাব জানতে তো আর বাকী নেই। তাই ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই কুঞ্জম্মদ আর পাত্তু পরস্পরকে কাছাকাছি পায় জীবনের মত।

একদিন মা কুঞ্জম্মদকে বলে, 'দেখ কুঞ্জম্মদ, তোমার বাবার শরীর দিনকে দিন ভেঙে পড়েছে। তোমার আরও একটু শক্ত হওয়া দরকার।' মার কথায় কুঞ্জম্মদের চোখ থেকে যৌবনের

রঙীন চশমা নেমে আসে।······এইভাবে দিন কাটানো আর চলবে না। মা, বাবা আর বৌয়ের পেট চালানোর ভার তার নিজেকে নিতে হবে। বাবা আজ সম্পূর্ণরূপে কাজ করতে অক্ষম। কুঞ্জম্মদের খাটাখাটুনি দিনের পর দিন বাড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে একদিন পাত্তুর গা গুলিয়ে বমি হয়। মুখে ঘনঘন জল আসতে থাকে। কুঞ্জম্মদ খুব ঘাবড়ে যায়। মা তাকে বুঝিয়ে বলে, 'ঘাবড়িও না বাবা, বৌমা আমাদের······ তোমরা পুরুষ মানুষ তোমরা এসব বুঝবে না।'

কুঞ্জম্মদ বোবা দৃষ্টি মেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকায় সে বলে, 'ওরে বোকা আমাদের হাঁড়িতে ভাগ বসাতে আর একজন আসছে বুঝলি?'—বুঝলো বৈকি সে। সঙ্গে এও বুঝলো যে নতুন আগন্তুকের জন্য আজ থেকে তাকে আরও বেশী রোজগার করতেই হবে। কুঞ্জম্মদ মাছ ধরার কাজে উঠে পড়ে লেগে যায়। বাপ-বেটায় দুজনে একসঙ্গে মাছ ধরতে যায়। সারাদিন মাছ ধরে। যতক্ষণ না অন্ধকার ডানা মেলে এসে সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ততক্ষণ তারা ফেরার নামটি করে না। ঘরে ফিরে এসে পাত্তুর কাছে ছুটে গিয়ে কুঞ্জম্মদ জিজ্ঞাসা করে—'কি পাত্তু, আজ কেমন আছ?'

'আমি তো ভালই আছি, তোমার কিছু হয়নি তো?'

আসলে দুজনেরই স্বাস্থ্য অনেক ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে পরস্পরকে জানায় না। অনুভব করে। আগন্তুকের কথা ভেবে তারা সব কিছু ভুলে যায়। শিশুর হাসি আর তার খেলা দেখার উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় তারা দিন

গোনে। বুড়ো, কাঠঠোকরা-খাওয়া নারকেল গাছের খোঁদলে পয়সাকড়ি জমায়। একদিন সে বুড়িকে বলে, 'এসব জমাচ্ছি নাতির অন্নপ্রাশনের জন্য।'

'তুমি কি করে বুঝলে নাতি হবে?'

'আরে পাগলি, ওটা আমি আগেই জানি। উত্তন পরিবারে প্রথম সন্তান ছেলেই হয় বুঝলে?'

'ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক বিনা যন্ত্রণায় হয়ে গেলেই ভালো।'

উত্তনের কথা ফললো। পাত্তু ফুটফুটে এক ছেলের মা হলো। কুঞ্জম্মদ ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আবেগ মিশ্রিত আনন্দে বলে, 'দুষ্টু ছেলে, এতদিন তুই ছিলি কোথায়?'

শিশুটি নিজের ভাষায় উত্তর দেয়—নবাগতের বুড়ি ঠাকমা সে দৃশ্য দেখে আর হাসে। বুড়ি তার স্বামীকে বলে—'কুঞ্জম্মদের জন্মের পর তুমি লজ্জায় আঁতুড় ঘরে ঢুকলে না, আজ দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড।'

বুড়ো বলে, 'আজকাল দিন বদলেছে। তুমি যা বলছো সে তো পঁচিশ বছর আগেকার কথা।' দুজনের চোখে মুখে পঁচিশ বছর আগেকার স্মৃতির রেখা উদ্ভাসিত হয়।

শিশুর জন্মের পর থেকে কুঞ্জম্মদ সম্পূর্ণ বদলে যায়। এখন সে একটি শিশুর বাবা। উপযুক্ত বাবা হতে চায় সে। এখন তার জীবনে আছে শুধু কাজ। আমোদআহ্লাদ আর বিশ্রামের সময় নেই। নিজেকে বাঁচতে হবে, মা, বাবা, ছেলে, বৌকে সুখী করার ভার সম্পূর্ণরূপে তার উপর।

জীবনের সমস্ত কিছুকে সে নিজের কাজ আর পরিবারের মধ্যে সীমিত করে ফেলে। প্রতিবেশীরা বলে 'ছেলেটি জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ভাগ্য খুলে গেছে। ছেলেটি খুব পয়া।'

রমজান পর্ব এগিয়ে এলো। বর্তমানে উক্তন অত্যন্ত দুর্বল, সমুদ্রে আর যায় না। নতুন শিশুর জীবনে এটি দ্বিতীয় রমজান। কুঞ্জম্মদ সব ঠিক করে পাত্তুকে জানিয়ে দিল সে ঐদিন বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করবে। করলও তাই। অন্যান্য কিছুর ব্যবস্থা করার ভার বাবার উপর দিয়ে নিজে সমুদ্রে পাড়ি দিল। সে ঠিক করলো প্রত্যহের তুলনায় সেদিন থেকে তাকে অনেক বেশী রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সঙ্গে নিল এক প্রতিবেশীকে। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে গেল তারা। মনে তাদের উপার্জন বাড়ানোর অনমনীয় আগ্রহ।

প্রথমদিনই ভাগ্য তার খুলে গেল। বিরাট বিরাট মাছ পড়তে লাগলো তার জালে। আরো বিরাট মাছ ধরার আশায় সে এগিয়ে গেল আরো দূরে। দূরে........আরো দূরে........ রমজান খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করতে হবে। নগদ পয়সা চাই অফুরন্ত। সাথীর কথায় কান দেওয়ার মত সময় নেই। আরো এগিয়ে যায়—আরও দূরে—নীলাকাশ যেখানে সমুদ্রের বুক ছুঁয়েছে সেই দিকে।

সন্ধ্যা নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। তখনও তারা ফেরে না বাড়িতে। কোনদিন ফিরতে এত দেরী হয় না! উক্তনের মন কোন অজানা আশঙ্কায় আকুল হয়ে যায়।

'ছেলেটা এখনও ফিরলো না কেন বুঝতে পাচ্ছিনা।' বুড়ো নিজের স্ত্রীকে বলে।

'হয়তো ফেরার পথে সোজা বাজারে চলে গেছে। নতুন কাপড় কেনার জন্যে।'

'গেলেই বা........আচ্ছা হায়দার কি ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, সে তো ফিরেছে।'

'আর আজিজ?'

'সেও।'

'বিরায়চুর ছেলেও কি ফিরেছে?'

'হয়তো ফিরেছে।'

'যাই, সমুদ্রের ধারে একবার ঘুরে আসি।'

'পাত্তু তো আগেই এগিয়ে গেছে।'

'আমিও যাই না, দেখি।'

'আমিও আসবো নাকি?'

শিশুটিকে কোলে নিয়ে পাত্তু আগেই সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সমুদ্রের গর্জন এত গগনভেদী যে বলার নয়। হাজার হাজার রাক্ষস যেন একসঙ্গে চীৎকার করছে! চারিদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। সে একলাই সমুদ্রের ধারে ধারে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার স্বামীকে। ওটা কি নৌকো? হ্যাঁ, তাইতো এইতো কুঞ্জম্মদের নৌকো! কিন্তু কুঞ্জম্মদ কোথায়!

'বাপ্পা কোথায় মা?' কোলের শিশুটি প্রশ্ন করে।

অনেকদিন আগের একটি কথা হঠাৎ পাত্তুর মনে পড়ে যায়। নৌকোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে সে কথা ভাবে।

একবার কুঞ্জম্মদ ঠাট্টা করে তাকে বলেছিল, 'যাবার সময় তোমাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব! কিন্তু আজ সে একাই চলে যায়নি তো?……'

*   *   *

এক সকালে উত্তন জাল বুনছে। পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলে তার দাত্নর পাশে বসে আছে।

'দাত্ন, কি চাই তোমার?'

'জালটি বুনে আমাকে দেবে দাত্ন?'

'কিসের জন্যে?'

'সেই শয়তানকে ধরার জন্যে যে আমার বাবাকে নিয়ে গেছে।'

এদের কথাবার্তা রান্নাঘরে পাত্তুর কানে যায়। সেই ভাবতে পারেনি যে তার ছেলে কোনদিন সমুদ্রে যাবার কথা চিন্তা করবে। সে ছুটে এসে উত্তনের হাত থেকে জালটি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে বুকফাটা কান্নায় চীৎকার করে ওঠে, 'না—না কিছুতেই না! আমার ছেলেকে আমি কিছুতেই সমুদ্রের দিকে যেতে দেব না। তার চেয়ে আমি ভিক্ষে করবো, চুরি করবো, সবকিছু করবো কিন্তু তাকে কিছুতেই জেলে সাজতে দেব না। কিছুতেই না! চলে আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে। এদের কাছে থাকিসনি, এরা তোকেও মেরে ফেলবে!'

খানিকটা শান্ত হবার পর সে ভাবে—সবার দুয়ারেই যে ভাতকাপড়ের অভাব, সে অভাবের জ্বালা ভুলতে পারলেও পবিত্র রমজানের দিনে দু'পাঁচ ভাইয়ের হাসিমুখের কয়েকমুঠো

খোরাক জোগাড় করতে যে পেশা মানুষকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়—সেই পেশা তাকে গ্রাস করতে আসছে। এখানে থাকলে তোর ঘাড়েও ওরা এই পেশাই চাপিয়ে দেবে। স্বামীহন্তা লোকটাকে একবার হাতের কাছে পেলে সে যেন সেটাকে মুঠোয় পিষেই অণু পরমাণু বানিয়ে দেয়।

'তুমি বুঝতে পারছো না বৌমা। সব কাজেই মা এক অবস্থা। মাছ ধরাই আমাদের জাত-ব্যবসা।' বুড়ো দীনকণ্ঠে বলে। 'খোদার মর্জি হলে বাপদাদার অভিজ্ঞতায় এতেই ভাগ্য খুলে যাবে!'

'কপাল খুলবে না, বলুন কপাল পুড়বে!' পাত্তু চীৎকার করে বলে ওঠে। 'আমি কিছুতেই আমার ছেলের কপাল পোড়াতে পারবো না। আপনি কি ভুলে গেছেন আপনার ছেলের কথা?'

'আমার সবকিছুই মনে আছে বৌমা। সবকিছুই গাঁথা আছে। কিন্তু......' কথাগুলো বুড়োর মুখ দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে এলো যেন সেটা কান্নারই আওয়াজ।

বুড়ি সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। সে তার মৃত স্বামীর মা। চুল পেকে গেছে। শরীরের চামড়া কাদায় ডোবা মানুষের মত ঝুলে পড়েছে। মুখে অসংখ্য খাঁজ। সারাটি শরীর থরথর করে কাঁপছে। কুঞ্জম্মদকে সে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছে। শিশু কুঞ্জম্মদকে প্রসব করার কান্নাহাসির সঙ্গে সে সুপরিচিত। পাত্তু হয়ত আরও কিছু বলত, কিন্তু মুখে তার আর একটি কথাও সরলো না।

সমুদ্রের তীর থেকে কোন এক নওজোয়ান জেলের গান ভেসে আসে। পাত্তু কান পেতে সে গান শোনে। এ যেন কুঞ্জম্মদের গাওয়া সেই গান। হঠাৎ তার সমস্ত সত্তায় সমুদ্রের প্রতি একটা অদ্ভুত মমত্ব জেগে ওঠে। তার যেন মনে হয় তাদের শৈশব কৈশোর আর যৌবনের সমস্ত সুখদুঃখের সাক্ষী ঐ সমুদ্র আর জেলের পেশা তার স্বামীর স্মৃতিপুত পবিত্রতম কাজ। ঐ গানের মধ্যে যেন তার স্বামীর কণ্ঠনিসৃত মাভৈঃ বাণী উৎসারিত হচ্ছে। তাই মুহূর্ত কয়েক আগের রূঢ়তায় সে নিজেই লজ্জিত হয়। শাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধরে সবেগে বলে, 'মা আমাকে মাপ করো।' বুড়ী বিস্ময়াহত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

সমুদ্রের ঢেউ আসে। একের পর এক ঢেউ এসে কূলে আছাড় খায়। সেই উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গকে উপেক্ষা করে জেলেরা এগিয়ে যায় সমুদ্রের বুকে জীবিকার সন্ধানে।

ছেলেটি অদূরে পড়ে থাকা জালটাকে ছোট্ট দুটি হাতে তুলে নিয়ে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকায় সফেন নীল সমুদ্রের দিকে।

●

কুটুম্ব

সর্দার কে. এম. পানিক্কর

দু'এক পুরুষ আগের পারিবারিক ঐতিহ্যকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিসর্জন দেবার চেষ্টা করলেও বিধবা কল্যাণী আম্মার মৃত স্বামীর আমলেও এই বংশের যা নামডাক ছিল তা কোনক্রমেই ম্লান হবার নয়।

ছোট মেয়ে সারদার বিয়ে হল পাস-করা এক ছেলের সঙ্গে। নতুন জামাইয়ের সরকারী চাকুরী লাভের সম্ভাবনা। পরিবারের সমস্ত গৌরবের উৎস সম্পত্তিটাকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেবার মর্মান্তিক প্রস্তাবে কল্যাণী আম্মাকে শেষ পর্যন্ত মনে মনে সায় দিতে হল। এতে করে সবদিক থেকেই গোটা পরিবারটি উচ্ছন্নে যাবে—এ কথা জেনেও এ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া ভিন্ন অসহায়া বৃদ্ধার গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য সামাজিক আইনকানুন মানতে গেলে বাপ-মা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের বিনা অনুমতিতে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কল্যাণী আম্মা সম্মতি দেবেন নাই বা কেন! হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে, সুখে থাকবে—এই না বাপ মায়ের চিরদিনের কামনা বাসনা? তিন তিনটি মেয়েকে সৎপাত্রে দান করেছেন তিনি। একমাত্র ছেলে বিদেশ বিভুঁইএ চাকরী করে। এই বুড়ো বয়সে

ঝামেলা পুষে লাভ কি। তার চাইতে ওরা যদি খুশী হয় তবে বাটোয়ারা করে দিলেই চুকে যায়।

যে পরিবারের কর্ণধাররা একদিন যথেষ্ট গৌরবের অধিকারী ছিলেন তাদের অবর্তমানে সেই পরিবারের কাণ্ডারী হিসাবে নিজেকে ভাবতে বেশ একটু গর্ব অনুভব করেন কল্যাণী আম্মা। তাঁর বিচারও তাই হওয়া চাই সুচিন্তিত। কোনরূপ খুঁত যেন এতে না থাকে। নিজের কাছে নিজের মর্যাদা যেন হানি না হয়—সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর, তাই তাড়াহুড়া করে কিছু করার আগে বেশ ভালভাবে আগাগোড়া একবার ভেবে নিলেন তিনি ; সম্পত্তিটা ভাগ করা কি ঠিক হবে ? এতে কি সকলের উপকার হবে ?

বড় মেয়ে নলিনীর স্বামী কাছাকাছি কোন্ এক সহরে ওকালতি করে। তার রোজগার মন্দ নয়—মেজ মেয়ে লীনার বিয়ে হয়েছিল এক বিখ্যাত ধনীর দুলালের সঙ্গে। কিন্তু এখন তাদের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। সারদার স্বামী এখনও বেকার। সুতরাং সম্পত্তিটা যদি ভাগ করে দিয়ে দেন তাহলে তো সবারই খানিকটা উপকার হয়।—এখনও তাদের কুড়ি একর আবাদী জমি আর বহু নারকেল বাগান রয়েছে, চোখ বুজলে সম্পত্তির অংশ নিয়ে হয়ত বিরোধ বাধবে। তার চাইতে জীবিত অবস্থায় ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়া বরং ভাল। মেয়েদের এই যুক্তিতে কল্যাণী আম্মার কোন আপত্তি ছিল না, শুধু "ভাগ বাটোয়ারা" কথাটি তিনি কেমন যেন সহ্য করতে পারতেন না। এই বিশেষ কথাটির জবাবে তিনি বললেন—

'দেখি ভেবে কি করা উচিত। না হয় অনাথ আশ্রমকে দান করে যাব। আমিও তো এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।'

মেয়েরা অবশ্য বৃদ্ধার এই কথায় আদৌ খুশী হতে পারেনি, কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের অভিমতের বিরোধিতা তারা করেনি।

সুযোগ বুঝে অনাথ আশ্রমের সম্পাদক বৃদ্ধার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলেন, 'আপনি বরং অনাথ আশ্রমের নামেই সম্পত্তিটা লিখে দিন। সম্পত্তি দেখাশোনার ঝামেলা কি এই বৃদ্ধ বয়সে পোষায়? আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ অবশ্য আশ্রমের তহবিল থেকেই পাবেন।'

'না, তার কোন দরকার নেই, এর ভবিষ্যৎ যে কি হয় তা বহুবার আমি দেখেছি। অনাথ আশ্রমে সব দান করে দিয়ে নিজে আমি অনাথ হয়ে বসে থাকি এই ত আপনারা চান! সম্পত্তি দান করা না করা আমার হাতে, আপনারা অবশ্য ঘোরাঘুরি করবেন এ তো জানা কথা।'

'বেশ তো মা, এক কাজ করুন না কেন, অনাথ আশ্রমের ব্যবস্থাটা নিজের হাতেই নিয়ে নিন না। আপনি তো একলাই পড়ে আছেন, এতে আপনার হাতে এক আধটা কাজ তবু থাকবে।'

'তা ভেবে দেখব।'

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একদিন সব ভাবনা চিন্তার অবসান করে ভাগ বাটোয়ারার কাজটা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। বৃদ্ধা নিজের দখলে রাখলেন বাড়ি আর তার আশে পাশের জমিটা।

আদুরে বড় মেয়ে বায়না ধরল—'মা আমার কাছে চল না কেন, এত বড় বাড়িতে একলা থাকতে কি তোমার ভাল লাগবে? তার চাইতে শহরে চল। আরামে থাকবে। কত নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাবে।'

মেজ মেয়ের ইচ্ছা মা তার সঙ্গে থাকেন। স্বামীর বিরাট সংসার। সে চায় মা এসে তার সংসারে থাকুন। 'এখানেই তো নতুন বাড়ি তৈরি করব। তখন কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে মা। আমি আর শহরে যাচ্ছি না।'

কল্যাণী আম্মা ভালভাবে জানতেন মেয়েদের এই আবেদনে আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু মায়ের প্রতি এই দরদের প্রতিযোগিতা যে কেন তা তাঁর কাছে মোটেই অজ্ঞাত ছিল না।

'কিন্তু এখন তো এই ধরণের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সারদার স্বামীর একটা কিছু উপায় না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গেই আমাকে থাকতে হবে—তা সে চাক্ বা না চাক্। এ নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই, হাজার হোক সে ত এখনও খুকীটিই রয়েছে। কি আর এমন বয়েস হল তার।'

এর পর নীরব থাকা ছাড়া উপায় কি। সারদা রইলো তার মায়ের সঙ্গে। সবাই অবশ্য জানত এ ব্যবস্থা নিতান্ত সাময়িক। সারদা মনে মনে কল্পনার জাল বুনতো—শহরে স্বামীর একটা চাকরী যদি কোন মতে জুটে যায়, তবে তারা গিয়ে বাঁধবে একটি সুখের নীড়, তাদের দাম্পত্যজীবন অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় হয়ে উঠবে ছন্দময়, প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা তাদের মধ্যে নিয়ে আসবে অপরূপ এক মাধুর্য। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল

ততই যেন তার জীবনটা বিষাদময় হয়ে উঠতে লাগল। যেন চারদিকে মরুভূমির শূন্যতা। তাছাড়া সম্পত্তির অংশ পাবার পর থেকে আর্থিক ব্যাপারে তার পরনির্ভরশীলতা না থাকায় মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু আধটু মনোমালিন্য দেখা দিতে লাগল।

কল্যাণী আম্মার কাছে এ যেন বিরাট এক বিস্ময়। এক তীব্র বিষময় জ্বালার দাহন তিনি যেন অনুভব করতে লাগলেন। একি হল! বিষয়সম্পত্তি ভাগের পর থেকে কি যেন এক যোগসূত্র হারিয়ে গেছে। দিন রাত চিন্তার জাল বুনেও, তাকে তিনি ধরতে পারছেন না। যতই দিন যেতে লাগল ততই তাঁর মনে হতে লাগল ছেলেমেয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ শিথিল হয়ে আসছে। অনাথআশ্রমে বরাদ্দ অর্থ ক্রমশঃই বেড়ে চলল। মাঝে মাঝে এ নিয়ে সারদা অনুযোগ করত, 'তোমার অর্থের উপর অনাথআশ্রমের চাইতে আমাদের অধিকার অনেক বেশী।' কল্যাণী আম্মা বেশ চটে যেতেন এ কথায়।

সারদার স্বামী রাজধানীতে কোন এক সরকারী চাকরীতে বহাল হল।

'মা, উনি কাজ পেয়ে গেছেন, আমাকেও ওঁর সঙ্গে শহরে যেতে হবে। তুমিও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবে। হ্যাঁ মা, তুমি সেখানেই বেশ আরামে থাকতে পাবে।'

মুখে মুখে এ খবর সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। গাঁয়ের লোকজন কল্যাণী আম্মাকে শহরে যেতে বারণ করলে। বাইরে

থেকে অবশ্য কল্যাণী আম্মাকে বিশেষ বিচলিত বোধ হত না। কিন্তু অন্তরে তাঁর নিদারুণ মর্মজ্বালা, বিষয়সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার পরিণাম তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। তার সর্বেসর্বা ছিলেন কল্যাণী আম্মা। বিবাহিত ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে ছিল না বটে, তবু সবার মিলনক্ষেত্র ছিল এ বাড়িটি। এ বাড়ি ছিল তাদের সুখী জীবনের মর্মকেন্দ্র। শত দুঃখেও এ বাড়ি ছিল তাদের অসীম আনন্দের উৎস। এ বাড়ির আকর্ষণ তারা কখনও ভুলে থাকতে পারেনি।

আর এখন? এখন সর্বত্র যেন বিরাট এক শূন্যতা। তারা এ বাড়িকে এখনও নাকি ভালবাসে আগের মতই। তবু কিসের যেন অভাব তারা সব সময়ই অনুভব করে। এই বিশাল পৃথিবীর রূপ কি তাহলে বদলে যাচ্ছে? আমাদের আমলে লোকে সবচাইতে বেশী মর্যাদা দিত কুলগৌরবকে। স্ববংশ, কুল, পরিবার ছেড়ে দুদিনের জন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবাই যেত না। আর আজ? কি যে দিনকাল পড়েছে! কুল-গৌরব, বংশমর্যাদা, পারিবারিক মাহাত্ম্য এ যেন আর টিকে থাকছে না। একান্নবর্তী পরিবারের মাহাত্ম্য আজ আর নেই। বাজারের আলু পটলের চাইতে বেশী একে কেউ দাম দেয় না। মা! তার কোন সার্থকতাই যেন আজ নেই। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে কল্যাণী আম্মা অকূল পাথারে ভেসে চলেছেন। কোথায় এর শেষ? অনেকদিনের একটা লুকানো সত্য, একটা কথা তিনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন।

সেটা নিতান্তই তাঁর আত্মকাহিনী। সবে মাত্র তাঁর যৌবনের উন্মেষ হতে শুরু করেছে। তখনকার জীবনের ধারা ছিল আলাদা। বাড়িতে কত লোক—ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট বাচ্চা আর শ্বশুর মশায়—যাঁর আওয়াজ পেলে আশেপাশের সকলের থরথরি কম্প শুরু হত। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। আজকের মতই এই পরিবারের কেউ কেউ চেয়েছিল বিষয়আশয় নিয়ে আলাদা থাকতে। কর্তা সিংহবিক্রমে সেদিন গর্জে উঠেছিলেন—'চার তল্লাটের সেরা বনেদী পুরনো ধনী পরিবার এইটি। এ তল্লাটে খুব কম লোকই পাবে যারা এই পরিবারকে শ্রদ্ধা করে না। আর তোমরা কিনা চাইছো একে ভেঙে চুরমার করে দিতে!' কত তফাৎ সেদিন আর আজকের মধ্যে!

অনাথআশ্রমের সম্পাদকের স্ত্রীও এলেন সারদাকে বাধা দিতে। তার এটুকু বুঝতে দেরী হলো না যে এদের মনে দুরভিসন্ধি উঁকি মারছে। কল্যাণী আম্মাকে ডেকে তিনি বললেন, 'আপনি এসে অনাথ আশ্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিন না কেন? আপনি তো কার্যকরী সমিতিতে রয়েছেন। বেতনভুক ম্যানেজারের মত দায় সামলানো কাজ তো আর আপনি করতে পারবেন না!'

'নিজের ছেলেমেয়েদের বড় করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বাপু, এখন এই বুড়ো বয়সে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। আমি কিছুদিন এখন বড় মেয়ের কাছে থাকতে চাই। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে বেচারীর সংসার। চাকর বাকর রাখার

সামর্থ্য তার নেই আমি জানি। তাদের ওখানে নাতি নাতনী নিয়ে বেশ সুখেই আমার কাটবে বাছা।'

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। সারদা যাবার আগে খবর এল, বড় মেয়ে নলিনীর ছেলের জন্মদিন আগামী সোমবার। মেয়ে জামাইয়ের খুব ইচ্ছে সারদাকে নিয়ে কল্যাণী আম্মা সেখানে যেন অবশ্যই যায়।

কল্যাণী আম্মা শহরে যেতে রাজী নয়। সংস্কার তাঁকে বাধা দেয়। বাছবিচার আর সামাজিক নিয়মকানুন পালন শহরে সম্ভব নয়। সারদার বিয়ের আগে অবশ্য নানান ঝঞ্ঝাট তাকে পোহাতে হত। সেটাও একেবারে তুচ্ছ করার মত নয়। আজ অবশ্যি আর সে হাঙ্গামা নেই। তবু যাবেন কি যাবেন না এ নিয়ে দোদুল্যমান রয়েছেন। কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত সারদার ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁকে রাজী হতে হল।

মেয়ে জামাইয়ের দিক থেকে আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ছিল না। বাড়ির সব চাইতে সেরা কামরাটি নির্দিষ্ট ছিল কল্যাণী আম্মার জন্য। সাদর অভ্যর্থনা, যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন কোনটারই অভাব ছিল না। নিজের হাতের তৈরী মিষ্টি আর নাতির জন্য কেনা সোনার কবচ সঙ্গে করে এনেছিলেন তিনি।

গ্রীষ্মের খর রৌদ্রতাপে শুষ্ক ধরণীর বক্ষ ভেদ করে দিনের পর দিন উত্তপ্ত শ্বাস নির্গত হওয়ার পর হঠাৎ আকাশের কোণে একটু জলভরা মেঘের আবির্ভাব যেমন নতুন জীবন

দান করে, রৌদ্রতাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে প্রথম বারিবর্ষণের ফলে চারিদিকে যেমন অপূর্ব শ্রী এবং অপরূপ শোভা দেখা দেয়, তেমনি অপূর্ব এক অনুভূতি জেগে ওঠে বৃদ্ধার মনে প্রথম দৌহিত্র দর্শনে। বার্ধক্যজনিত অকারণ রুক্ষতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না তাঁর আচারব্যবহারে, বাৎসল্যরসের স্পর্শমণির ছোঁয়ায় নবজীবনের জোয়ার দেখা দেয়। মাত্র দু' এক ঘণ্টার মধ্যে জমে উঠল নাতি ও দিদিমার অন্তরঙ্গতা। অপূর্ব এই অন্তরঙ্গতা—স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত।

সন্ধ্যায় নলিনী মায়ের কাছে কথাটা পাড়ল। 'সারদা চলে গেলে তোমায় তো একলাই পড়ে থাকতে হবে। তুমি আমার এখানে চলে আস না কেন! তোমার কোন কিছুর অসুবিধা হবে না। খোকন তো এরি মধ্যে তোমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে।'

'সব তো বুঝলুম, কিন্তু জামাই ভাববে কি?'

'তোমার জামাইয়ের মতও তো তাই। মা মেয়ে একসঙ্গে থাকলে কাজের সুবিধা হবে।'

'তোমাদের দুজনার মতই যখন এই তখন ভেবে দেখা যাবে, আগে সারদা চলে যাক্ তো!'

আসলে এই বুড়ো বয়সে একলা থাকার কথা ভাবতেই কল্যাণী আম্মার যেন কেমন অস্বস্তি লাগে—ভয়ানক অসহায় বোধ করেন নিজেকে। নাতিকে প্রথম দর্শনের পর থেকে তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত অপত্যস্নেহ অবলম্বন পেয়ে যেন নতুন রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। তাঁর হৃদয়

বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে শ্যামলিমায় ভরে উঠল। মৃৎশিল্পী যে অবস্থায় নরম মাটিকে নিজের কল্পনা অনুযায়ী মূর্তি গড়ার কাজে ব্যবহার করে, ঠিক সেই অবস্থায় কল্যাণী আম্মা পেলেন তাঁর নাতিকে। একাজের দায়িত্ব বড় কঠোর, কর্তব্য দুরূহ। অথচ এই দায়িত্ব পালনে আনন্দ আছে, আকর্ষণও অস্বীকার করা যায় না।

তাছাড়া নিজের নাতি নাতনীদের দেখাশুনা করতে, মানুষ করে তুলতে কার না ভাল লাগে? মনে মনে তাই তিনি ভাবতে শুরু করলেন। হ্যাঁ, এই হবে আমার প্রধান কর্তব্য আর এই কাজে সাফল্য অর্জন কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু আরও একটা দিক কি ভাববার নেই? কল্যাণী আম্মা সব কিছুর সাথে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে বসে। তবু সতর্কতার সঙ্গে ভালমন্দ উভয় দিকই বিচার করে নলিনীর প্রস্তাব তিনি মেনে নেবেন ঠিক করলেন।

পরদিন উৎসব। দিদিমা সারাদিন কর্মব্যস্ত। যত্ন করে নাতিকে চান করিয়ে নিজের পছন্দসই জামাকাপড় আর সোনার মাতুলী পরিয়ে দিলেন।

'চল এবার মন্দিরে যাওয়া যাক।' একাজের তিনিই যোগ্য পাত্রী।

'কিন্তু মা, খোকনের বাবা তো এসব ভালবাসেন না। তিনি বলেন, "পূজোপার্বনের সব পয়সাই তো বামুনদের ভোগে চলে যায়।" '

বৃদ্ধার মাথায় যেন বাজ পড়ল। 'তবে কি পূজোআচ্চা কিছু হবে না? এমন অলক্ষুণে কথা কেউ কি কোথাও শুনেছ? আজও তোর জন্মদিনে আমি সনাতন নিয়ম মেনে মন্দিরে পূজো দিয়ে আসি। আমি নিজে শাস্ত্রমতে সব ব্যবস্থা করে আসি। আর তুই কিনা তোর ছেলের প্রথম শুভ কাজে একথা বলতে গেলি!' অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগলেন কল্যাণী আম্মা।

'কিন্তু মা, আমি কি করতে পারি বল? ওর বাবার যদি এটা পছন্দ না হয়—'

'সে কি তোরও ছেলে নয়? তার রক্তে কি আমাদের বংশের রক্ত নেই? তাই যদি হবে তবে তোরা যা খুশি কর। আমায় বাছা রেহাই দে।'

'তুমি অমন করে বলছ কেন মা? তুমি ত জান পুরনো দিন আর নেই। খোকন আর আমাদের পরিবারের কেউ নয়। সে যে ওঁর বংশের ছেলে, আজকাল স্বামীস্ত্রীকে নিয়েই একটা পরিবার। বিয়ের পর স্ত্রীকে তো বাপের পরিবারের লোক বলে মানে না।'

ব্যথায় মনটা ভরে উঠলো কল্যাণী আম্মার।

'তাহলে তোর কথার মানে দাঁড়াচ্ছে, তোর ছেলে আর আমার পরিবারের কেউ নয়! মেয়ের গর্ভে জন্মালেও তার উপর আমার পরিবারের কোন অধিকার নেই। এইত? এটা তো ভারী অন্যায়, অস্বাভাবিক। তুই-ই বা এমন অন্যায় আর হাস্যাস্পদ কথাকে কি ভাবে মেনে নিলি? আমাকে একথা

বলতে তোর মুখে একবার আটকালো না? তুই কি আমার পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাস না?'

'নিশ্চয় চাই মা, তবে আজকাল খোকনের বাবা আর মাকে নিয়েই তো তার পরিবার। অন্তত কানুন তো তাই বলে।'

মাকে একটু নিরিবিলিতে থাকার সুযোগ করে দিয়ে নলিনী চলে গেল পার্টির আয়োজন করতে। ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

অতি কষ্টে বৃদ্ধা নিজেকে সামলে নিলেন। আঘাতটা তাঁর কাছে মর্মান্তিক বইকি। তাঁর সোনার সংসার, দেশের সব চাইতে সেরা পরিবার হিসেবে তাঁদের বেশ গর্ব ছিল। আজ সবই সব ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। তিন তিনটি মেয়ের গর্ভধারিণী তিনি, তারাই কি শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে উঠল?

'না না, এ হতে পারে না। তাঁর পরিবার এখনো সেই পাড়াগাঁয়েই রয়েছে। মেয়েরা অস্বীকার করতে চায় করুক'—রাজ্যের যত ভাবনাচিন্তা কল্যাণী আম্মার মন তোলপাড় করে তুলল।

'তাহলে কেন নলিনী তার স্বামীগৃহে আমায় ডেকে নিয়ে এল? তিনটি মেয়েতে আমার ঘর ভর্তি। আর সে চায় কিনা আমি তার স্বামীর কথায় উঠবস করব! তার সঙ্গে নিজের পরিবারের লোকের মত ব্যবহার করব? তাকে খাওয়াব, তার এঁটো বাসন মাজব? না, না, কক্ষনো না। জীবন থাকতে এ কক্ষনো হতে পারে না।'

সান্ধ্য পার্টি বেশ জমে উঠেছে। সামান্য জ্বরভাব দেখা দিল, কল্যাণী আম্মা শুয়ে পড়লেন।

আর পাঁচটা উৎসবের মত খোকনের জন্মদিনের উৎসবেও এসে জড়ো হয়েছে শহরের নামকরা সব লোক। হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান, কোন বাছ-বিচার নেই। দিব্যি জমিয়ে পার্টি হচ্ছে। তাদের কথাবার্তা আর চালচলন দেখে বৃদ্ধার মনে হল হিন্দু সমাজের আচারবিচার তো দূরের কথা, যাদের এ বাড়ি আসার কথা কোন ভাবেই ভাবতে তিনি পারেন না, তারাই এ বাড়িতে বেশ বহাল তবিয়তে খানাপিনা নিয়ে মশগুল!

'নলিনী ঠিকই বলেছে, এটা আমার বাড়ি নয়, হতে পারে না। যেখানে এরকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে সে পরিবারকে আমি কি করে নিজের বলে ভাবব? শেষ পর্যন্ত মেয়েটাও পর হয়ে গেল!'

শরীর খারাপের অছিলায় কল্যাণী আম্মা সেদিন আর কিছু খেলেন না। বিজাতী, বিধর্মীরা যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনাচার চালিয়ে গেছে সে বাড়ির যে জাত নেই এবং এটাই যে কল্যাণী আম্মার অভুক্ত থাকার কারণ নলিনী বা তাঁর স্বামী তা মোটেই বুঝে উঠতে পারেনি। অধিক রাতে ঘুমোতে যাবার আগে নলিনী তার মায়ের শারীরিক অবস্থা জানতে এল।

কোনরূপ ভূমিকা না করেই কল্যাণী আম্মা বলে উঠলেন, 'আমি কালই ফিরে যেতে চাই। তুমি হয়তো এখন ওবাড়িকে তোমার নিজের বলে ভাবতে পার না, কিন্তু আমি ভাবি।

আমার পূর্বপুরুষ যেখানে দেহত্যাগ করেছেন সম্মানের সঙ্গে সেখানেই আমি মরতে চাই।'

'সে কি কথা মা! এই তো সকালেই তুমি আমার এখানে থাকতে রাজী হলে।'

'অতশত আমি বুঝি না, তুমি আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও'—দৃঢ়ভাবে বললেন কল্যাণী আম্মা।

কল্যাণী আম্মা ফিরে এলেন পাড়াগাঁয়ে—নিজের বাড়িতে। কিছুদিন পর সারদা স্বামীর সঙ্গে শহরে চলে গেল। নিয়ম মাফিক আশীর্বাদ জানালেন বৃদ্ধা।

কল্যাণী আম্মা এখন একলা সেই বিরাট বাড়িতে। চারদিক শূন্য—খাঁ খাঁ করছে। তাঁর স্মৃতিপটে একে একে ভেসে উঠল অতীতের টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো। এ বাড়ি তাঁর কাছে শুধু ইটপাথরের একটা প্রাসাদমাত্র নয়, এটা তাঁর পূর্বপুরুষের গৌরবনিকেতন। প্রতি সন্ধ্যায় যত্নের সঙ্গে নিজের হাতে প্রতিটি কামরা ধুয়ে মুছে উদাসভাবে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন তিনি। খেলায় মেতে উঠেছে ছোটরা, ছুটোছুটি করছে চারদিকে, মেয়েরা যে যার কাজে ব্যস্ত, সারা বাড়িটা কোলাহল-মুখর—এ সব দৃশ্য যেন সবে সেদিনের, স্পষ্টভাবেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তাঁর জীবনের মস্ত বড় সান্ত্বনা—এই পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ তিনি একদিনের জন্যও ভুলতে পারেন নি। তাঁর চোখ বোজার সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে এই পরিবার—তার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যাবে! দিনরাত এসব ভাবনা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

অনাথআশ্রমের চাঁদা নিয়মিতভাবেই তিনি পাঠিয়ে দেন, কিন্তু কার্যকরী সমিতির সভায় যোগদানের কোন উৎসাহ দেখা যায় না। সারদা অন্তঃসত্ত্বা, যথাসময়ে এ খবরও তাঁর কাছে এল। আশ্চর্য! এত বড় সুখবরও তাঁর মনে কোন রেখাপাত করতে পারল না। অবশ্যপালনীয় সামাজিক রীতিঅনুষ্ঠান অনুযায়ী মেয়ের সাধ দেওয়ার কথাও তিনি ভুলে গেলেন।

সারদা তো এই পরিবারের কেউ নয়! সে এখন তার স্বামীর পরিবারভুক্ত। এটাই কানুন⋯কানুন। কি হবে আর পুরনো সামাজিক রীতি পালন করে?

কয়েকদিন পরের ঘটনা। কল্যাণী আম্মা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। এ যাত্রা তিনি আর রক্ষা পাবেন না, এই তাঁর দৃঢ় ধারণা। বেঁচে থাকার কোন আগ্রহই তাঁর ছিল না। প্রতিবেশীরা খবর পাঠালেন তাঁর ছেলের কাছে, কর্মস্থলে। মেয়েদের কাছেও যথাসময়ে খবর পৌঁছাল। সবাই ছুটে এল। খাটের চারপাশে কল্যাণী আম্মাকে ঘিরে দাঁড়াল—ছেলে মেয়ে, জামাই সবাই।

অপলক নেত্রে কল্যাণী আম্মা ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে উদাসভাব। বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে চলেছেন। যাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি কথা বলছেন তাঁরা কেউই পার্থিব জীব নয়। অশরীরী পূর্বপুরুষের সঙ্গেই চলেছে তাঁর বাক্যালাপ। কখনও বা মৃতা মাকে, আবার কখনও হয়তো দিদিমাকে লক্ষ্য করে অনর্গল তিনি কথা বলে চলেছেন।

ভাষা অবোধ্য। দৃষ্টি তাঁর নলিনীর দিকেই নিবদ্ধ। ছেলেমেয়েরা মায়ের কথার একটি বর্ণও বুঝে উঠতে পারল না, মায়ের অন্তিম সময় উপস্থিত। কল্যাণী আম্মার মুখমণ্ডল এক অপরূপ হাসির আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'তোরা আমায় পুবের কামরাটায় নিয়ে চল, ও-ঘরেই আমি জন্মেছি আর আমার মা মরেছেন ও-ঘরেই।' মুমূর্ষু বৃদ্ধার শেষ করুণ আবেদন।

সে ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর শেষবারের মত কল্যাণী আম্মা ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকালেন।

দারুণ তৃষ্ণা

মলৈয়াট্টুর রামকৃষ্ণন্

'সেণ্ট্রাল হস্‌পিটাল এণ্ড নার্সিং হোম।' আমি ঢুকতেই ঘূর্ণী চেয়ারে সোনালী কাগজ অলঙ্কৃত চুরুট পানরত ডাক্তার বালিনা উচ্ছ্বসিত হাসি-আবেগের ঢেউ তুলে প্রশ্ন করল—'হ্যাল্লো! তুমি! কখন এলে?'

বছর কয়েক আগে আমরা দুজনে এক সঙ্গেই মেডিকেল কলেজে পড়তাম। প্রথম বছরেই আমি ফেল করি। টাকা-কড়ির অভাব ছিল। কাজেই ডাক্তারি পড়া আর হলনা। অন্য পথ ধরতে হল। কিন্তু বালিনা ডাক্তারি শাস্ত্রে অনেক উর্ধ্বতর পদবী লাভ করে বেরিয়ে এল। আগ্রহ ছিল তার মনে। আর ছিল অগাধ সম্পত্তি। তার পর সে শুরু করলো মনরোগে বিশেষ শিক্ষা নিতে। মনস্তত্ত্বের উপর তার লেখা একটা প্রবন্ধ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কোন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত হয়। দেশে ফিরল সে একজন সুযোগ্য ডাক্তার হিসাবে। আর কিছুদিনের মধ্যেই মানসিক ব্যাধির সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হিসাবে প্রসংশাও অর্জন করল।

আমাদের দুজনের দেখা সেই কবে হয়েছিল। বহু বছর পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ না হলেও চিঠির আদানপ্রদান বজায় ছিল। তারই উপর ভিত্তি করে আমাদের বন্ধুত্বও ছিল অটুট।

বোম্বে যাওয়া ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বালিনার সঙ্গে দেখা করার কথাও স্থির করেনি।

দেখলাম এই ক'বছরে ডাক্তারের চেহারার অনেক পরির্তন হয়েছে। দেহটি বেশ নাদুসনুদুস হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। চোখে চশমা। সোনালী ফ্রেমের ঐ চশমার জ্যোতিস্মান চোখে আত্মবিশ্বাসের উজ্জ্বলতা। তার চোখের দৃষ্টিই যেকোন লোককে বুঝিয়ে দেবে তার সুপ্রতিষ্ঠার কথা।

আমরা দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্পগুজব করি। নিজের প্রাক্‌টিস ও সাফল্য সম্পর্কে অনেক কথাই ও বলে উচ্ছ্বসিত ধীরতার সঙ্গে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জারক রসে বেশ মনোহারী সে কথা। প্রথম প্রথম তার ছিল টাকা জমানোর ঝোঁক। টাকা জমানো ছাড়া অন্য কোনকিছুতে সে আনন্দ পেত না। জমিয়েছেও প্রচুর টাকা। কিন্তু আজ আর তার সে টাকা জমানোর আকাঙ্ক্ষা প্রবল নয়। আজ সে এক লক্ষ টাকার চেয়েও একটি জটিল রোগীর রোগ মুক্তিতে বেশী আনন্দ পায়। তাই ইদানিং সে বিনা পারিশ্রমিকেই কিছু কিছু রোগীকে দেখে।

ঠিক এই সময় এক রূপবতী তন্বীর দ্রুত আগমনে আমাদের আলাপের গতি রুদ্ধ হল। পরনে তার দামী শাড়ী, বেশ আঁটসাট্ করে পরা। আভরণও মহার্ঘ্য এবং রুচিশীল। বয়স খুব জোর কুড়ি।

'বসুন', ডাক্তার হাসিমুখে বলে।

'ডাক্তার, কাল রাত্রে আমি প্রসব করেছি'—লজ্জারক্ত সাবলীলতার সঙ্গে সে নিজেই বলে ওঠে।

আমি আশ্চর্য হলাম। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে নারী একটি জীবনকে জগতের সান্নিধ্যে এনেছে তার দেহে সৃষ্টির বেদনা কোন ছাপই রেখে যেতে পারেনি!

আমার চোখের বিস্ময়কে ডাক্তারের অর্থপূর্ণ একটি দৃষ্টি মেয়েটির হাবভাব কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার মত কিছু একটা খুঁজে নেবার নির্দেশ দিলে। ডাক্তার জেরা শুরু করে।

'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে।'

'ছেলেটির রঙ কি রকম?'

'গায়ের রঙ! গোলাপের মত, ডাক্তার, গোলাপের মত। ওজনও মন্দ নয়। প্রায় ন' পাউণ্ড। চুলগুলো কি বলবো—কোকিলের মত কুঁচকুচে কালো। কিছুটা আবার কোঁকড়ানো। কিন্তু হলে কি হবে, বড় দুষ্টু। ওর চোখ দেখেই বোঝা যায় ও বড় দুষ্টু ছেলে।'

'ঈস্, কি আশ্চর্য বাচ্চাটিকে একাই ছেড়ে এসেছ? সে কাঁদবে না? মা-মা-করে হয়তো কাঁদছে।' ডাক্তার এমন ভাবে বলে যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। কথা কটা শুনেই সে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়।

'ঠিকই বলেছ ডাক্তার, আমার খোকন কাঁদবে। হয়তো এখন কাঁদছে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। ডুকরে ডুকরে

কাঁদছে। আবার আসবো, এখন যাই। আমি আমার খোকনকে কিছুতেই কাঁদতে দেব না, কিছুতেই না।'

সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। ডাক্তারও আমার দিকে ফিরে বেদনাপূর্ণ একটা অদ্ভুত হাসি হাসে।

'কে এই মেয়েটি?' আমি জিজ্ঞাসা করি। কারণ নিজের কোন জিজ্ঞাসাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারি না।

'কি রকম মনে করছ?'

'কিছুই ঠিক বুঝতে পারিনি ভাই।'

'আমার এক রুগী।'

'পাগলি না কি?'

'হ্যাঁ তা এক রকম পাগলিই বটে।'

'কিন্তু দেখে একেবারে মনেই হয় না যে, মাথায় কোন গোলমাল আছে।'

'এটা এক ধরনের রোগ। সব সময় সে স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে। শুধু মাঝে মাঝে একটি কথা বলবে। বলবে তার প্রসব হয়েছে। আর অনর্গল বলে যাবে তার মানসপটে থাকা দুরন্ত শিশুর কথা।'

'কিন্তু ওকে এইভাবে ছেড়ে রাখা কি ঠিক হচ্ছে?'

'রোগীকে তার ব্যবহারের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে কোন রকমে সন্দেহপ্রবণ না করাই আমার পদ্ধতি। বিশেষ করে যখন কেবলমাত্র সন্তান গর্বই ওর রোগের একমাত্র লক্ষণ। এ রকম ধরনের বেশ কিছু সংখ্যক রোগী আমার হাতে এসেছিল। যাদের কোন একটি বিশেষ ভুল ধারণা ছাড়া সবই স্বাভাবিক। কিছুদিন

আগে একজন সৈনিক এসেছিল। সবদিক থেকেই লোকটি খুব ভালো। কেবল তার সব সময় মনে হত তার শরীর যেন কাচের। খুব আস্তে আস্তে হাঁটত। পুরু গদিওয়ালা চেয়ারে বসত। কেউ তাকে ঠেলে দিলে বাচ্চা ছেলের মত হাউ মাউ করে কাঁদত। তার মনে ভয়, কাচের শরীর আঘাত পেলেই ভেঙে যাবে। যেন ননীর পুতুল। আরও মজার কথা আছে। গত বছর এক অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা, তার বদ্ধমূল ধারণা যে সে এক চায়ের কেটলি ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে বলে উঠত, 'আমাকে কাত করো। চা পড়বে।'

'ঐ সৈনিক আর অফিসার দুজনই কি ভালো হয়ে গেছে?'

'আজকের দিনে এ সব কেস ভালো না হবার কোন কারণ নেই। আরও কত জটিল কেস আমার হাত দিয়ে ভালো হয়ে বেরিয়ে গেছে!'

আমার মাথায় সে মেয়েটির ব্যাপারই ঘুরে ফিরে এসে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা মেয়েটির এ রোগের রহস্য কি?'

'তার জীবন-নাট্যের প্রতিটি অঙ্ক যেকোন দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করতে বাধ্য। তবে আশ্চর্য এই যে তার নিষ্পাপ মনে প্রকৃত অর্থে কোন দাগই আর কাটতে পারে নি।' ডাক্তার আলাদা এক চুরুট ধরিয়ে বলে।

মেয়েটির পুরো জীবন-কাব্য শোনার আগ্রহ আমাকে সুতীব্র ভাবে পেয়ে বসে।

প্রথমে ডাক্তার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে জানাল, যে-কারো জীবনকাহিনী শোনানো কোন ডাক্তারের পক্ষে শোভনীয় নয়। তাছাড়া এটা তার উচিতও নয়। কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে এবং আমি তার খুব নিকট বন্ধু বলেই সে বলতে সাহস করছে। অবশ্য প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, আমি যাতে সে কাহিনী কাউকে না বলি।

'ওর নাম শীলা। পারিবারিক দিক দিয়ে এর আগে থেকেই ওদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ছিল। শীলার বাবার নামও তুমি নিশ্চয় শুনেছ। তিনি এখানকার নামজাদা উকিল।

'দেড় বছর আগে শীলার বিয়ে হয়। একরকম ধরে নিতে পার, তখন থেকেই তার রোগের সূত্রপাত। সে তার মনের মত স্বামী পায় নি। শীলা কলেজে পড়ত। ভালবাসত তারই সহপাঠী মতি নামক এক তরুণকে। ওদের দুজনের মধ্যে শপথ ছিল, ওরা পরস্পরকে বিয়ে করবে।'

'হ্যাঁ, হলেই ভাল হত।'

'কিন্তু ওদের এই শপথের কথা শীলার অভিভাবকদের কাছে গোপনই থেকে যায়। কারণ তাঁরা ছিলেন গোড়া সংস্কারবাদী। শীলা তার বাপমায়ের একমাত্র মেয়ে। তার পিতা ছিলেন দক্ষ আইনজ্ঞ। গঠনতন্ত্রে মানুষের অধিকার সম্পর্কীয় বক্তব্য বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরতেন বিচারালয়ের দেয়ালগুলো কাঁপত। মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই। কিন্তু আইনের জাহাজ এই ভদ্রলোকও তাঁর মেয়ের মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়ার কথা

এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেন নি। তাঁর ধারণা, তাঁর পছন্দই মেয়ের পছন্দ। তাঁর সিদ্ধান্তকে নিজের জীবনে কার্যকরী করাই মেয়ের আদর্শ। তবে ভদ্রলোককে দোষ দিয়েও লাভ নেই—কারণ স্ববিবোধীতার ঐতিহ্যও তিনি আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই পেয়েছেন। এ শ্রেণীর লোকের অভাব আমাদের সমাজে নেই। মতি গরীব ঘরের ছেলে। বিষয়সম্পত্তি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। ছিল চিত্রকলার কিছুটা নিপুণতা। অর্ডারী ছবি এঁকে যা পেত তা দিয়ে কোন রকমে চলত।'

এতদূর বলে ডাক্তার বালিনা কথায় ফাঁকে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিল। তারপর আবার বলতে শুরু করে।

'আসলে মতিকে শীলা নিজের মনে গেঁথে নিয়েছিল। তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে কল্পনা করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। অথচ বাবার কথা না মানার মত বুকের পাটা তার ছিল না। বাবার কাছে মুখ ফুটে বলতে পারল না যে, মতিকে সে ভালবাসে। মতির সঙ্গে ঘর করলে সে সুখী হবে।

'শেষ পর্যন্ত বাবার সিদ্ধান্ত অনুসারে খুব ঘটা করে বিয়ে হল। বিয়েতে আমিও গেছিলাম। বর কোন সরকারী বড় অফিসারের ছেলে। স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে নিখুঁত। স্বয়ং ভাল একজন ইঞ্জিনীয়ারও বটে।

'দু-একবার শীলাকে তার স্বামীর সঙ্গে আমিও দেখেছি। নতুন জীবনকে মানসিক স্বীকৃতি দেবার সঙ্কল্প যেন তখন তার মধ্যে আমি দেখেছিলাম। স্বামী ভালো লোকই, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেও স্ত্রীকে ভালবাসত খুব। শীলার

হাসি তার মনকে অনুপ্লাবিত করত আনন্দরসে। শীলাও চেষ্টা করত তাকে অনুরূপভাবে ভালবাসতে। কিন্তু তা করতে গিয়েও শীলা প্রকারান্তরে মতিকেই খুঁজত তার স্বামীর মধ্যে।'

একটু থেমে চুরুটে গোটাদুই দমভর টান দেবার ফাঁকে কি যেন ভেবে নিয়ে ডাক্তার আবার শুরু করে।

'এসব কথা আমাকে জানতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে, অনেক পরে। যা ঘটেছে তাকে আমি একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি এই যা।...আমেরিকায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির জন্য শীলার স্বামী সরকারি বৃত্তি পায়। ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর স্বপ্ন সফল করার জন্য তাকে অবিলম্বেই বিদেশ যাত্রা করতে হয়।

'সে দিনগুলির কথা শীলা নিজেই আমাকে বলেছে। মানসিক রোগীর সঙ্গে সহানুভূতিসুলভ কথা বললে তারা সম্পূর্ণরূপে মনের অর্গল উন্মুক্ত করে দেয়। স্বামীর সান্নিধ্যে থাকাকালীন মতিকে সে খুঁজত স্বামীর মাঝে।

'কিন্তু স্বামী চলে যাওয়ায় পর মতি সরাসরি তার ছায়া ফেলতে লাগলো শীলার মনোমুকুরে। স্মৃতির রোমন্থন চলল দিনের পর দিন। মতির কথা বলতে আজও শীলা অদ্ভুত রকমে উচ্ছ্বসিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ছেলেটা যেন ওকে জাদু করেছে।

'ঠিক এই ধরণের অবস্থায়, শীলা একদিন তার বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমায় যায়। ফেরার পথে হঠাৎ মতির সঙ্গে দেখা। সে সাক্ষাৎ ঘুরিয়ে দেয় শীলার জীবনের মোড়। পুরনো অনুরাগ আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়।

'এরপর থেকে প্রায়ই তাদের দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হত।

দুজনেরই মন পরস্পারের প্রতি অতি দুর্বল। মাসের পর মাস এই মেলামেশা চলতে থাকে। একদিন শীলা জানতে পারে যে তার মধ্যে এক ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে! সে গর্ভবতী। ক্রমে শীলার বাবাও মায়ের মারফৎ জানলেন এ খবর। এরপর শুরু হলো পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নীতিহীন প্রচেষ্টা।

'শীলা প্রায়ই কাঁদে। সে কান্নার পেছনে কারণ আছে। আছে সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর আছে ন্যায়অন্যায় বিচারবিশ্লেষণের মর্মবেদনা। একদিন তার মনে হল, সে যেন তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুগভীর বিশ্বাস নিয়ে তার স্বামী গেছে বিদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, শীলার জীবন আরো সুখী করে তুলতে। আবার কখনও সে আতঙ্কিত হয় আগমনোন্মুখ মতির স্মারকের বিরুদ্ধে ঘাতকদের চক্রান্তে।

'সেদিন আমি দেখেছি তার বাবাকে। নামজাদা উকিলের সে গাম্ভীর্য নেই তাঁর মুখে। মেয়ের জীবনকে, নিজের মর্যাদাকে নিষ্কণ্টক করে তোলার জন্য অতি অসহায় ভাব। আমেরিকা থেকে তাঁর জামাইয়ের ফেরার আগেই কিছু একটা করতে চান তার বাবা, এমন কিছু করতে যাতে কাক-পক্ষী টের না পায়। আর তার মাত্র একটি রাস্তাই তো খোলা আছে। তা হল গর্ভপাত।

'এরপর স্বভাবতই তিনি আমায় ঐ অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে বলেছিলেন। আমি রাজী হইনি। এ ব্যাপারে কোন সাহায্য না করার কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি সেদিন ফিরে গেছিলেন অসহায়ভাবে। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক পরে আবার তিনি এলেন আমার কাছে। এবার তাঁর অবস্থা আরও চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ।

'তিনি আমাকে জানান যে শীলা ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ বাড়ির সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর আঘাত পায়। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এক লেডী ডাক্তারের কাছে। তিনি কি এক ওষুধ দিয়েছেন ফলে তার শরীর আরও বিগড়ে এবং কমজোর হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথা বলে। কাজেই শীলার বাবা সেদিন আমায় সকরুণ আবেদন করলেন যাবার জন্য।

'শীলার বাবা যা বল্লেন তা ছাড়াও কিছু জানার জন্য আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম তাঁর বাড়িতে।

'শীলাকে পরীক্ষা করে বুঝলাম কোন আঘাত সে পায়নি। আমার কাছে পাঁচ-সাতটি সিঁড়ি গড়িয়ে পড়ার কথা মিথ্যা মনে হল। লেডী ডাক্তার যে ওষুধ খাইয়েছেন তার প্রতিক্রিয়ার ফল। শীলার অভিভাবকদের অজ্ঞাত নয়, এও বুঝলাম। ভারী রাগ হলো আমার। আমি চলেই আসতাম। তবে মেয়েটির ওপর আমার কেমন যেন একটা মায়া হল। তাকে এই সমস্ত স্বার্থপরদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারলাম না। আমি আমার মনোভাব গোপন না করেই উকিলকে দুটি পথের কথা বললাম—হয় অপারেশন নয় ওষুধ। কিন্তু এ অবস্থায় ওষুধের কার্যকারিতার কোন নিশ্চয়তা নেই এ-ও জানালাম। অপারেশনের ব্যাপারে তিনি সাগ্রহে রাজী হলেন।

'আমি তাঁকে বলি। ডাক্তার হিসাবে আমাকে অবশ্য শীলার মতও নিতে হবে। আমি এ কথা জোর দিয়েই বলি। এটি প্রত্যেক ডাক্তারেরই কর্তব্য। তারপর শীলার কাছে সমস্ত বক্তব্য পেশ করি।

'কিন্তু শীলার জবাব যা পেলাম, তার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। শীলা মুখ তুলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়। "না, আমি তা কখনই হতে দেব না। এ শিশু আমার। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আগে ধোঁকা দিয়ে আমাকে যে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে তা ফলেনি।"

'তার বাবা বিস্ময়ে আর ক্ষোভে নিস্তব্ধ হয়ে যান। তাঁর মুখে আর কথা সরে না।'

গল্পটি এতদূর এগুনোর পর আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কিন্তু শীলা আপত্তি করলো কেন?'

'স্বামীকে ধোঁকা দিয়েছে একথা তার মনে গুঞ্জন তুলেছিল সত্যি', ডাক্তার বলে যায়, 'কিন্তু শীলা হয়তো আরো ভেবেছে। কারণ যাই ঘটুক না কেন, একটি কথা সত্য ছিল যে, সে চাইতো মতির সন্তানকে নিজের গর্ভে ধারণ করতে, প্রসব করতে। বাবা তাঁর মতকে চাপিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু বাস্তবে তা ব্যর্থ হল। শীলা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হতে থাকে তার নতুন সন্তানকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য। এই সময়ে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখি, শীলা ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করছে। ঘটনাটা আমাকে ভারী চিন্তিত করে তোলে। কারণ, অবশ্যম্ভাবী অতি আগ্রহের ঘটনা

যদি ব্যর্থ হয় তবে তা প্রতীক্ষমানের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। আর দুর্বল মনের পক্ষে সে আঘাত হয় মারাত্মক।'

'শেষ পর্যন্ত শীলা কি শিশুটিকে কোলে তুলে নিতে পেরেছে?' আমি গল্পের শেষ জানার গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে বসি।

'না, তার দুতিন মাস পরে গর্ভপাত হয়ে যায়। এক রাত্রের একাকীত্বে শীলাই ছিল এ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী। সে কাঁদেওনি আর কাউকে ডাকেওনি। দুদিন পাথরের মত নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে সে বিছানায় পড়ে ছিল। শুধু তার চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুর ধারা বয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় গর্ভপাত হয়ে গেলে আলাদা কথা ছিল। এতটা ব্যথা পেত না। কিন্তু এমন এক সময় গর্ভপাত হল যা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না; উপরন্তু যখন তার মনে একটি শিশুকে পাওয়ার তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মনে হল সেই লেডী ডাক্তারের দেওয়া ওষুধেরই ফলে তা ঘটেছে। সে ভাবল হয়তো অনেক দেরিতে সে ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

'এদিকে ব্যাপারটি জেনে শীলার বাপ-মার কম আনন্দ হয়নি। খুব খুশী তাঁরা। বিপদ কেটে গেছে। আর কোন ভয় নেই। শীলার জীবন আর নষ্ট হয়ে যাবে না। তার স্বামীও জানতে পারবে না কিছু। একদিকে ভগবানের কাছে বাবা মানত করে। অন্য দিকে শীলা বালিশ ভিজিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। বুকফাটা সে কান্না।

'ঐ ভাবে দুদিন পড়ে থাকার পর শীলার জীবনে দেখা দেয় নতুন এক রোগ। মারাত্মক এক রোগের শিকার হয় শীলা। সেই পুরনো লেডী ডাক্তার আবার আসে। গর্ভাশয়ে সেপটিক হয়ে গেছে বলে জানায়। গর্ভাশয় অপারেশন করা হয়। শীলা আর জীবনে গর্ভধারণ করতে পারবে না। নিজের শিশুকে কোলে নেওয়ার আশার প্রদীপ সেখানেই নিভে যায়।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই ঘটনার পরে শীলা বর্তমান রোগের শিকার হয়।' ডাক্তার তাড়াতাড়ি গল্পটাকে শেষ করতে চায়।

'আজকাল সে স্বামীর কথা আর বলে না। এমন কি মতির কথাও তার স্মরণে নেই। সে এক নতুন দুনিয়ায় যেন বাস করে। সে যেন প্রত্যেক দিনই এক নূতন শিশুকে প্রসব করে!'

'আমেরিকা থেকে কি তার স্বামী ফিরেছেন?'

'দু মাসের মধ্যে তিনি ফিরবেন। শীলার বাবা চায় এরি মধ্যে তাকে সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তুলতে, রোগমুক্ত করতে। শীলার এই রহস্যময় কাহিনী আমি বাদে সেই লেডী ডাক্তারও জানে। আর কেউ আর জানে না। এ রোগ মুক্ত হলে তার বাবা-মার ধারণা শীলা তার স্বামীকে নিয়ে সুস্থ সবল জীবন যাপন করতে পারবে। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।'

'তার মানে কি তাকে সারিয়ে তোলা যাবে না?'

'সারিয়ে তোলা যাবে না কেন? অবশ্যই যাবে। তবে আমি ভাবছি সারিয়ে তুলব না। আমি তা করতে যাব কেন?'

'সেকি কথা, একথাতো ভাবতেই পারা যায় না!'

'নিশ্চয়ই পারা যায়। শীলা এখন অনেক সুখী। কল্প-লোকে সে আজ এক রাঙা টুকটুকে শিশুর মা। আজ তার মনে কত রঙীন কল্পনা। এ রোগ সারিয়ে তোলার ফলে তাকে সে কল্পলোক থেকে নেবে আসতে হবে বাস্তবে। কঠিন এ বাস্তব জীবনে যেখানে মনুষ্যত্বের মর্যাদা নেই, মৌলিক অধিকার যেখানে পদদলিত সেখানে সেরে ওঠার পরে তার জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে ওঠবে, আরো ভীষণ হয়ে ওঠবে।...তার চেয়েও আজকের এ জীবনে কি তার পক্ষে কল্যাণকর নয়?'

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছুই বলতে পারিনি। বোকার মত গুম হয়ে বসে থাকি।

বৌমা

ভিয়ারজী

ত্যাগরাজন্ অফিসের জন্যে ফিটফাট হয়ে নিল। জলের স্রোত যেমন করে সুযোগ পেলেই নীচের দিকে ধেয়ে চলে ঠিক তেমনি রওনা হতেই তার স্ত্রী পাঙ্গাজম্ স্বামীকে কিছু বলবার জন্যে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

ঘরের ভেতর শাশুড়ী মীনাক্ষী অসহ্য রাগে গজ্‌গজ্ করে ওঠে। মনে মনে বলে ওঠে, 'কথার যেন আর শেষ নেই। অফিসে যাবার সময়ও বিরাম নেই। আর একবার কথা আরম্ভ হলেই দাঁত বার করা হাসিতে যেন ওরা ফেটে পড়তে থাকে।' আক্ষেপের সঙ্গে বলতে থাকে, 'মরুগ্‌গে, জাহান্নামে যাক, ওসব। আমি আর কদিন!' বৌয়ের সাজগোজ করার সময়েও তার ছেলেকে সে দেখে দাঁত বার করে হাসতে। 'কি যে হয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের?' সে ভাবে নিজের ছেলেকেই সে ঠিক করতে পারে নি। পরের মেয়েকে আর কী করবে। রুদ্ধ রাগে ও ক্ষোভে গজ্‌গজ্ করতে করতে রান্নাঘরের হাঁড়ি-বাসনগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল পাঙ্গাজমের শাশুড়ী। ভেবেছিল এটাই হবে ওদের কথাবার্তা বন্ধ করার উপায়। কিন্তু ফল হল উল্টো। স্বামী-স্ত্রীতে হো-হো করে এমনভাবে প্রাণ খুলে হাসে যেন প্রবল ঝাঁকুনিতে বিরাট তেঁতুল গাছের অসংখ্য

পত্ররাশি অঝোরে ঝরে পড়ছে। মীনাক্ষীর কাটাঘায়ে পড়ে নুনের ছিটে। ফুঁসে উঠে হাতের হাঁড়িটা দিল ফেলে। মনে মনে বলে 'বুড়ো হয়েছি দেখে পরের ঘরের সেদিনকার মেয়েটিও আমাকে ঠাট্টা করে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।'

'বলি ও বৌ, ওখানে তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে শুনি। বলি রাস্তার লোকগুলো যে তোমাদের ঢং দেখতে পাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল আছে? বলি, লজ্জা-সরমের মাথাটাও একেবারে খেয়েছো নাকি?' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে মীনাক্ষী।

'তুমি তো বেশ বলছো মা! স্বামী-স্ত্রীর কথা যারা অমন হাঁ করে শোনে তাদের তো একটু লজ্জা হওয়া উচিত,' হাসতে হাসতে জবাব দেয় ত্যাগরাজন্।

স্বামীর কথায় চাপতে না পেরে না পেরে ফিক্ করে হেসে উঠল পাঙ্গাজম্। ক্ষণিকের জন্য শাশুড়ীর উপস্থিতিটাও সে ভুলে যায়। মীনাক্ষীর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। অবস্থাটা দেখে পাঙ্গাজম্ চলে যায় ঘরের ভেতরে। মীনাক্ষীও ধেয়ে চলে পেছনে পেছনে। সে চাইল বৌকে একচোট নিতে। কিন্তু বৌ তার কথার কোন জবাব দিল না, ত্যাগরাজনই তার হয়ে বলে হাসতে হাসতে। কেমন করে যেন সবই গেল তালগোল পাকিয়ে।

তারপর সকালে তাড়াতাড়ি রান্না চড়ানোর জন্যে ফেলে আসা শাড়ীটা কাচতে লাগল পাঙ্গাজম্। আর মীনাক্ষী এর উপরেই তার গায়ের ঝাল ঝাড়বার সুযোগ নিল।

সে বলে উঠলো, 'স্নান করার সময় কি হাতে রোগ কষ্ট হয়েছিল? তখন কাচলে এমন কী মহৎ কাজ বাকী পড়ে

থাকত ? ভোর থেকে শাড়ীটা দুপুর পর্যন্ত পড়ে থাকে, যতো সব অলক্ষ্মীর চিহ্ন ! ওঃ, কী ঘরের মেয়েকেই ঘরে এনেছি !'

পাঙ্গাজম্ তার পায়ের নীচে যেন মাটি দেখতে পায় না। পৃথিবী যেন তার কাছে নেই। সে মনে মনে ভাবে, শাশুড়ী আজ যে জিনিসকে ভাল বলে, কালকেই আবার তাকে খারাপ বলে। হপ্তা খানেক আগে স্নানের সঙ্গে সঙ্গে কাপড় কাচলেই শাশুড়ী চেঁচিয়ে বলে উঠতো, 'বলি, ও বৌ, ওকাজ এক্ষুণি না করলেই কি নয় ? আমি কি এবয়সে রান্নাঘরে পুড়ে মরবো। এখনও ভাত চড়েনি, ছেলে অফিসে যাবে কখন ? সত্যি কথা বললেই তো আজকাল খারাপ হয়ে যায়।' আর আজ তারই কথামত কাজ করলেও গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে থাকেন। পাঙ্গাজম্ জানে সে সময় কিছু বললেই শাশুড়ী ফোঁস করে উঠবে। তাই সে নীরবেই রইল।

ত্যাগরাজনেরও বিয়েতে অমত ছিল। সব সময় যার জন্য তার ঝগড়া হত। অবশেষে তার মত বদলাতেই হয়েছিল। মা বৃদ্ধা, বিধবা, রান্না করতে পারে না বলে।

মীনাক্ষীই নিজের মনের মত মেয়ে ঠিক করেছিল পাঙ্গাজম্‌কে। প্রথম দেখেই পাঙ্গাজমের সহজ সরল ব্যবহার তাকে আকৃষ্ট করল। বিয়ের পরও মীনাক্ষী বেশ কয়েক মাস খুব ভাল ব্যবহারই করল পাঙ্গাজমের সঙ্গে। এদিকে ত্যাগরাজনের সঙ্গে পাঙ্গাজমের বিভিন্ন উপন্যাস ও তার চরিত্র নিয়ে নানা রকমের তর্ক-বিতর্ক হত। গ্রাজুয়েট স্বামীকেও ম্যাট্রিকুলেট স্ত্রী মাঝে মাঝে পেছনে ফেলে দিত। একদিন

পাঙ্গাজম্ বলে উঠল, 'তোমার কথাগুলোর প্রত্যেকটাই ডাঃ জনসনের কথার মত মূল্যবান। তুমি বরং একটা ডায়েরি রাখো না কেন?'

'তুমি তো আছো। সেটাই যথেষ্ট'—সহাস্যে বলে ওঠে ত্যাগরাজন। সঙ্গে সঙ্গে পাঙ্গাজম্ বালিশের তলা থেকে একটা ডায়েরি বই নিয়ে এসে স্বামীর হাতে দেয়। ত্যাগরাজন একমনে পাতাগুলো উল্টে যায়। যতো এগোয় ততোই বিস্ময় বাড়ে, যেন একটা সুন্দর উপন্যাস। 'তোমার কাছে আমি কিছুই নই পাঙ্গাজম্। সত্যি তুমি বড়। তোমার যে দক্ষতা আছে তাতে তুমি সহজেই কোন গল্প বা উপন্যাস লিখে যেতে পার। অবসর সময়ে লেখো না কেন, বলতো।' ভাবে গদগদ হয়ে বলে যায় ত্যাগরাজন। 'তুমি জানো না কোন গল্পে বা উপন্যাসে যদি দেখি তার নায়ক নায়িকার নাম ত্যাগরাজন আর পাঙ্গাজম্ তখন আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকবে না।'

'তোমার বৌয়ের ঐটাই বাকী আছে,' মুখ ঘুরিয়ে ত্যাগরাজনের মা বলে চলে যায়। সে বুঝতে পারে না যে কেন তার মা আজকাল তার বৌয়ের এতোটুকু ভালকেও সহ্য করতে পারে না, অথচ বিয়ের পর মা কতো লোকের কাছে বৌয়ের সম্বন্ধে কতো ভালো কথা না বলেছে। আর আজ যখন-তখন বাইরের লোকের কাছেও কেন তার মা নিন্দে করে, তার কোন হদিসই সে পায় না।

পাশের গাঁয়ের এক বৃদ্ধা বান্ধবী বলে, 'মীনাক্ষী, তুমি ভাগ্যবতী। আহা, অমন সুন্দর বৌ আর হয় না। আমার

ছেলের কাছে সব শুনেছি। প্রায়ই তোমার ছেলে ওর কাছে পাঙ্গাজমের সম্পর্কে গল্প করে। দাও না দিদি আমার ছেলের জন্যেও এমনি একটি সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে দেখে।'

'কুকুরকে সিংহাসনে বসালেও সে কুকুরই থাকে, অন্য কিছু হয় না। ছেলেটাকে যে কী খাওয়াল, কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলে আমার মধুতে-পড়া মাছির মত কাবু হয়ে থাকে। আমি যে এ ঘরের মধ্যে বড়, সেদিকে ওর গ্রাহ্যই নেই। যখনি তাকাই তখনি দেখি হয় দাঁত বার করে হাসছে আর না হয় মোটা মোটা বই হাতে করে আমার ছেলের সঙ্গে তর্ক করছে। এসব দেখে দেখে আমার গায়ে জ্বালা ধরে ওঠে। কিন্তু কি করব আমার পোড়া কপাল, নয়তো নিজের ছেলেকেই ঠিক করতে পারিনি··· আর··· ।'

অলক্ষ্যে দরজার আড়ালে পাঙ্গাজম্ অজ্ঞান হয়ে পড়ে এ সব শুনে। শাশুড়ী চমকে উঠে।

সেদিন ত্যাগরাজন সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে গুন্ গুন্ করতে করতে ঘরে ঢুকল। অন্য দিনের মত আজ পাঙ্গাজমকে কেন যেন ফিটফাট দেখাচ্ছে না বলে তার মনে হল। চোখে মুখে যেন কিসের মলিন রেখা ফুটে উঠেছে। 'বাঃ তোমাকে তো বেশ হনুমানের মত দেখাচ্ছে!' হাসতে হাসতে বলে ত্যাগরাজন। অন্যদিন এ অবস্থায় পাঙ্গাজম্ হয়তো বেশ একটা ইনটেলেকচ্যুয়াল্ উত্তর দিত। কিন্তু সেদিন শুধু নীরবে আড়চোখে তাকিয়ে রইলে স্বামীর দিকে। স্ত্রীর এই নির্বিকার ভাব দেখে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 'বাঃ, পাঙ্গাজম্।

তুমি যে এখনো সাজোই নি? ভুলে গেলে নাকি, আজ না আমাদের সিনেমায় যাবার কথা ছিল।'

'আজ আমাকে না হয় বাদই দিলে। খুব মাথা ধরেছে।' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠে পাঙ্গাজম্।

'বেশ, তাহলে থাক। যাবো বলে সকাল সকাল করে ছুটে এলাম, তা তোমার যখন...।'

য়োনাম্ উৎসব দেখার জন্য পাঙ্গাজমের বাবা তার জামাই-মেয়েকে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করে পাঠাল মীনাক্ষীকে। মীনাক্ষী খুব আনন্দের সঙ্গে শুধু পাঙ্গাজমকে পাঠানোর আয়োজন করে ফেললে।

'পা যখন বাড়িয়ে আছো বাপের বাড়ি যাবার জন্যে, তখন আমি আর বারণ করছি না, তবে বেশী দিন কাটাবার চেষ্টা করো না। দুচার দিন পরেই ফিরে এসো।'

ত্যাগরাজন অনিচ্ছাকৃত ভাবেই যেন অনুমতি দেয়। পাঙ্গাজম্ বাপের বাড়ি চলে গেল। ত্যাগরাজন অবশ্য আগের মতই স্নান করে, খায় দায়, অফিসে যায়, ফিরে আসে, আবার খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ে। সব কাজই সে করে, কিন্তু তার ভিতরে কোন মাধুর্য, প্রাণ বা আকর্ষণ সে খুঁজে পায় না। সে সবই করে চলেছে যেন যন্ত্রের মত।

এদিকে মীনাক্ষী তার ছেলের অফিসে যাওয়ার পর একশোবার সে ঘরে ঢোকে আর বেরোয়। সারা দুপুরটা তার এইভাবেই কাটে। একটুও ঘুম আসে না। সময় যেন আর কাটতে চায় না।

হঠাৎ সেদিন ত্যাগরাজন্ তার ডায়েরি খুলে দেখে এক মাসের পাতাগুলো তার খালি পড়ে আছে।

মীনাক্ষী বিড় বিড় করে বলে চলে, 'এক মাস হয়ে গেল তুলসীতলায় আলপনা কাটা হয়নি। আলনার সাজানো রং বেরঙের কাপড়গুলো উধাও হয়ে গেছে। বাগানে গাদা গাদা ফুল ফোটে আর ঝরে যায়। টেবিলের ওপরকার বইগুলো একটার উপর একটা যেন হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার সময় আর কোন মিহি সুরের গান কানে ভেসে আসে না। সমস্ত ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে। ভুতুড়ে বাড়ি না কি! যতই হোক মেয়েটা থাকার সময় সারা ঘর কেমন যেন চাঙ্গা থাকতো। মুখপুড়ী এত চঞ্চল—পারা যায় না বাবা এদের নিয়ে।' এই ভাবে বিড় বিড় করতে করতে সারা ঘরগুলো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ছেলের টেবিলে একটা চিঠি দেখতে পেল। তাইতো ছেলে কাল বলছিলো বটে একটা চিঠি এসেছে পাঙ্গাজমের কাছ থেকে। কিন্তু কি আছে তাতে জিজ্ঞেস করলে 'বিশেষ কিছু না, ভাল কথা তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়েছে,' বলে ত্যাগরাজন্ অফিসে চলে গেল। মীনাক্ষী চিঠিটা হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবে, 'এত বড় চিঠিতে শুধু বউ আমায় প্রণামই জানিয়েছে—অসম্ভব! দেখি সামনের বাড়ির ছেলেটাকে দিয়ে পড়াই।'

ছেলেটা চিৎকার করে পড়ে। "তোমার পাঙ্গাজমের হৃদয় নিংড়ানো প্রণাম নাও। একগুঁয়েমি করে চলে এসেছি বলে হয়তো তুমি দুঃখিত বা আশ্চর্যান্বিত হয়েছ। কিন্তু এরও

একটা কারণ আছে। আজ কদিন ধরে মা যেন কেমন কেমন হয়ে গেছেন। মা আমাকে কত ভালবাসতেন কিন্তু আজকাল আমাকে···যাক অন্য মেয়েদের মত আমি শাশুড়ীর সব কথা তোমাকে জানাতে চাই না। আমার প্রতি মার এই ধরনের আচরণের কারণ হাজার মাথা কুটেও পারিনি বের করতে, নিষ্ফল হয়েছি। যাই হোক এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বাপের বাড়ি চলে এসেছি। এমনকি, সেদিন যে তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতেও গররাজী হয়েছি তারও একটা কারণ আছে। যাক্, আমার মনে একটা আশা আছে, আমার অনুপস্থিতিতে মার মনের পরিবর্তন আসবে। মা আমাকে আবার নিবিড়ভাবে ডেকে কোলে তুলে নেবেন। শুধু তোমার ভালবাসাই আমার মনের খোরাক দেয় না, আমার মনের একটা কোণ যেন ফাঁক হয়ে থাকে। যেদিন মা আবার আমাকে······যাক্ আজ এখানেই শেষ করি। মাকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাও। আশা করি তুমি ভাল আছ।

ইতি—

তোমার,

পাঙ্গাজম্

"পুনশ্চ ঃ কয়েকটা ছোট গল্প লেখা হয়েছে। মা ডাক দিলে যাব। তখন পড়ে শোনাব।"

মীনাক্ষীর মন যেন কেমন দমে যেতে লাগল। নীরবে ভাবে। তার মনে হল যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কুয়াশা যেন তার চারপাশের সমস্ত কিছুকে

দেখতে দেয় না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফিরে আসে মীনাক্ষী।

সেদিন রাত্রে ত্যাগরাজনের খাওয়ার সময় যন্ত্রণাবিদ্ধ ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় মীনাক্ষী বলে, 'বাবা ত্যাগু, এক মাস হয়ে গেল, বউ এখনো ফেরার নামটি করছে না, ও না থাকলে ঘরটা কেমন যেন খাঁ খাঁ করে, তুই কাল সকালেই গিয়ে নিয়ে আয় বাবা।'

ত্যাগরাজন্ ভাত মুখে তুলতে তুলতে থেমে হাঁ করে চেয়ে থাকে মার দিকে!

সৈনিক

টি. শিবশঙ্কর পিল্লাই

বিরাট সাইনবোর্ড টাঙানো এক অফিসের সামনে বিরাট এক ভীড় জমেছিল। সেও ঐ বেকারদের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কত লম্বা, কত মোটা সব কিছুরই হিসেব নিকেশ নেওয়া হল! বাপের নাম, বাড়ির ঠিকানা—মাত্র এ দুটোর উত্তর সে দিতে পারল না। সেই দেড়শো লোকের মধ্যে তার এই কাণ্ড দেখে সবার চমক লাগল।

সেদিনই তাদের নিয়ে যাওয়া হল অনেক দূরে। এগাড়ি ওগাড়ি করে আট দিন পরে তাদের নামিয়ে দেওয়া হল এক জায়গায়।

ট্রেনিং-এর সময় তাদের অনেক দুঃখ পোহাতে হয়েছে। কিন্তু পেট ভরে খেতে পাওয়ায় তার যেন সে দুঃখবোধ হতো না। শুধু তাই নয়, জীবনের বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতাও তার বাড়তে লাগল। এখন সে আর ভিখিরী নয়। সে আজ আত্মনির্ভরশীল। তার আছে নিজের বিছানা, নিজের বালিশ। করবার মত আছে তার কাজ, আর বাঁচবার মত আছে তার তাগিদ।

সেখান থেকে তাদের দলকে আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুদিন পরে সেখান থেকে আর একটা

শিবিরে। তারপর আরও কয়েকটি। এইভাবে কেটে গেল বছরের পর বছর।

একদিন কর্তৃপক্ষ এক মাসের ছুটিতে যে যার দেশে যেতে হুকুম দিলেন। সেদিন শিবিরের প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে উঠে আনন্দের ঢেউ। আজ তাদের প্রত্যেকেই আপনজনের মনের ডাকে দিতে পারবে প্রাণের সাড়া। তাদের নিজ নিজ গাঁয়ে ফেলে-যাওয়া সেই সোনালী সূর্যের উদয়াস্তের মনোরম দৃশ্যের জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই লোকটির যেন কোন উৎসাহ নেই। নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। সে কোথায় যাবে? পৃথিবীতে তার কে-ই বা আছে? সাগ্রহে অপেক্ষা করবার মা-ই নেই, আর বউ ছেলেমেয়ের কথা তো স্বপ্নেরও অতীত। কে একজন তার নাম রেখেছিল 'রামন', আর তার সঙ্গে 'নায়ার'-টাকে যে কে জুড়ে দিয়েছিল, তা সে জানে না।

পরের দিন ভোরে সকলের আগেই ঘুম থেকে উঠল। বাক্স ও বিছানাপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সকলের আগে।

আলপুষার* পথে-ঘাটে বস্তী-গলিতে দুচারদিন লোকে দেখল একজন সৈনিককে ঘোরাফেরা করতে। রাত্রেও ঘুরতো সে। সে যে কে, কোথাকার লোক বা কোথায় থাকে, তা কেউ জানে না। তারপর সে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

* কেরালার একটি শহর।

আর একটি শহর কোল্লমের এক গলিতে একটি বাড়ির সামনে একজন সৈনিককে দেখে একটা বাচ্চা মেয়ে ভয়ে কেঁদে উঠল। সে বুঝতে পারল ও-স্থান তার নয়।

এইভাবে কেটে যায় মাসের কুড়িটি দিন। মিললো না তার কোন স্বজনের সাক্ষাৎ। সে জানে না, আত্মীয়রা কোথায়, আর কারাই বা তার আত্মীয়।

উন্নত শহর থেকে দূরের একটি গ্রাম। পাহাড়ের তলায়, ক্ষেতের কাছে, সবুজ বনানীর আবেষ্টনীর মধ্যে একটি ছোট ঘরের বারান্দায় বসে একজন সৈনিক খাওয়া-দাওয়া করছে অনেকক্ষণ ধরে। একটি বৃদ্ধা তাকে খাওয়াচ্ছে খুব আদর যত্ন করে। সে তাকে ডাকল 'আম্মা' বলে, আর বৃদ্ধাও তাকে ছেলের মত আদর যত্ন করল। দুজনেই ঘরোয়া কথায় মেতে গেল। মা বলে,—'চার-পাঁচজনের সংসার বাবা, এতেই চলে। ক্ষেত-খামার না দেখলে উপোস করে মরতে হয়।.........এ কি! আর কটা ভাত খাওনা, বাবা!'

'না মা, ভীষণ খেয়েছি। প্রায় সের খানেক চালের ভাত খেয়ে ফেলেছি।'

'না রে বাবা, মাত্র দু তিন মুঠো ভাত খেয়েছ।'

'আচ্ছা মা, তোমার কোন ছেলে নেই?'

বৃদ্ধার চোখে জল এলো।—'ভগবান একটা দিয়েছিল বাবা, কিন্তু বছর কয়েক পরেই তা ফিরিয়ে নিল। বেঁচে থাকলে আজ তেইশ বছর, সাত মাস, চার দিনের হতো।

······ওকি! হাত ধুয়ে ফেলছো যে, আর কটা ভাত খাও বাবা।'*

'না মা, আর খেলে পেট ফেটে যাবে।'

জীবনে সে এই প্রথম একজনকে পেলো যে বলেছে, 'আর একমুঠো ভাত খাও না বাবা।'

পরের দিন ভোরে বৃদ্ধাকে বলল, 'মা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বল না, বাবা!'

'আমার নিজের বলতে সংসারে কেউ নেই।'

'হ্যাঁ, তাতো তুমি কালকে বলছিলে, বাবা।'

'পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে একটা কুঁড়ে ঘরও নেই, মা।'

'তুমি তো কালকে বলেছো। ওসব কথা সব সময় মনে করে মনের দুঃখ বাড়িয়ো না।'

'আমার যে একেবারেই কেউ নেই মা।'—বলেই গভীর দুঃখে কেঁদে উঠল। বৃদ্ধা তাকে কোলে তুলে নিল।

সেদিন দুপুরে বৃদ্ধার বাড়ির উঠোনে ছাঁদনাতলায় বৃদ্ধার মেয়ে নানীর সঙ্গে রামন নায়ারের বিয়ে হয়ে গেল।

সেদিনের গোধূলিবেলায় সস্ত্রীক, হাতে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে তাদের মিলিত জীবনে অনুভব করল অস্তগামী দিনমণির সোনালী কিরণস্পর্শ। পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট এমনকি প্রতিটি গৃহ আজ তাদের কাছে মানবিক হৃদয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

অসীম আকাশের সুদূর তারারাও যেন মিটমিট করে দরদী চোখের পলক ফেলে দেখতে থাকে এই দুটি মানব-মূর্তিকে।

'আজকে না গেলেই কি নয়? আজ থেকে যাও। কাল যেয়ো।' রামন ঘুরে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তারই স্ত্রী নানী তাকে ডাকছে। নানী তার স্ত্রী, সে তার স্বামী।

'না, নানী আজকে না গেলে ঠিক সময় পৌঁছুতে পারব না। কয়েক দিন পরেই ছুটি নিয়ে অবার আসছি। তুমি চিন্তা করো না লক্ষ্মীটি!'

'আমি পথ চেয়ে থাকব,—এসো।'

রামন শেষবারের মত নানীর দিকে চেয়ে এগিয়ে গেল।

সেই বাড়ির ঠিকানায় প্রত্যেক মাসে পারিবারিক ভাতা আসতো। ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনা হল। ভাঙা ঘর মেরামত করা হল। বৃদ্ধা প্রত্যেকদিন মন্দিরে যেতো, আর মেয়ে-জামাইয়ের সুখী জীবন কামনা করতো।

কয়েকমাস পর প্রত্যেকদিন নানী তার স্বামীর খাবার রেখে সকাল থেকে পথ চেয়ে থাকতো—এই বুঝি কেউ ডাক দেবে, সে ছুটে যাবে, দরজা খুলবে।

'তোর স্বামী আর কবে আসবে লো?' বান্ধবীদের প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারতো না।

একদিন পিওন একটা খাম দিয়ে যায় নানীর হাতে।

তাতে একজন সৈনিকের একটা ফটো। নানী সে ফটো বাঁধিয়ে দরজার উপর টাঙিয়ে রাখে।

তিন মাস পরেই নানী তার মাসিক ভাতাটা হঠাৎ কিছুটা বেশী পায়। ছমাস ধরে তা আরও বাড়ে।

কিছুদিন পরে তাদের থানা থেকে নানীকে ডেকে পাঠাল তিনটি ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে। নানী থানায় গেল। তিনটি ট্রাঙ্কই বেশ বড় বড়। তার একটিতে ছিল একজন সৈনিকের ইউনিফর্ম। অন্য ট্রাঙ্কের ভিতর ফেরৎ পাওয়া গেল বিয়ের সময়ের ফুলের মালাটি শুকনো অবস্থায়। নানী দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল পাথরের মত।

এক হপ্তা পরে নানীর নামে আসে এক হাজার টাকার একটি চেক। তারপর······আর কোন দিন কিছু আসে নি।

বিজনেস

উদ্ধব

নিজের পা আর টানতে পারছে না। সারা শরীরে ক্লান্তি নেমে এসেছে। গা ভার হয়ে গেছে—যেন বৃষ্টিতে ভেজা বালি। কিছুক্ষণ না জিরিয়ে আর এগোতে পারছে না। কিছুক্ষণ সে সেই অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ফুটপাথে বসে পড়ে।

রামকৃষ্ণনের মনে হচ্ছে সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। বিচারশক্তি লোপ পেয়েছে। বহুবার সে ঐ অফিসের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে নেমেছে। তবু তার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের ওপর বিশ্বাসে আর ভরসায় ফাটল ধরে নি। তার প্রতি সহানুভূতি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীর বেকার জীবনের এই ব্যথায় কার মন না মোচড় খায়? চাকরী খালি নেই কেন? কেন সকলের জন্য চাকরী নেই? কিছুক্ষণ সে ভাবে। তারপর তার মনে হয় এ সব আজেবাজে প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। ভাবনা বন্ধ করে। তারপর মনকে শূন্য করে অবাক দৃষ্টি মেলে পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকাতে তার যেন ভাল লাগে। কিন্তু কি লাভ? আবার তো ফিরে আসতে হবে ভাবনার জগতে।

'কলাই করাবেন না কি, কলাই, হাঁড়ি বাসন, ডেকচি কলাই!

করাবেন না কি কলাই ?'—একটি লোক চিৎকার করতে করতে চ'লে গেল।

কলাই করা আর করানো। দুটোই কত তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু কি আশ্চর্য এ দুটোর কোনটারই তার প্রয়োজন বা সামর্থ্য নেই! আর হাঁড়ির প্রশ্ন অবান্তর। তা বহুদিনই শিকেয় উঠেছে। আজ দুমাস ধরে সে এর-ওর বারান্দায় রাত্রিগুলো কাটাচ্ছে।

লোকটার চিৎকার আবার কানে ধাক্কা দিল। সে দূর থেকে রামকৃষ্ণনের কাছে আসছে। চিৎকার করতে থাকা লোকটা নাবল ফুটপাত থেকে পথে। দেড়টা চোখ তার, একটা চোখ লাল কুচকুচে কোকিলের চোখের মত, দাড়িটা পেকেছে। খুব ফুর্তির সঙ্গে সে হাঁটছে যেন সারা দুনিয়াকে কলাই করে ছাড়বে। রামকৃষ্ণনের পাশ কাটিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে যায়।—কলাই করাবেন না কি, কলাই—

'জাহান্নামে তোমার কলাই আর তুমি।' মনে মনে বলেই সে নিজের মুখটা ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে।

অনেকেই সেপথ দিয়ে যাতায়াত করছে। সবাই ব্যস্ত। সারা সংসার যেন ব্যস্ত। এত লোকের কাজ আছে। শুধু সে-ই কাজ পাচ্ছে না। একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত সামনের দিকে ঝুঁকে এগিয়ে চলেছে একজন ছুতোর মিস্ত্রি তার যন্ত্রপাতি নিয়ে। তার পেছনে ছুটে চলেছে একটি বাচ্চা ছেলে। হয়তো সে তার ছেলে। একজন টাঙ্গাওয়ালা খুব কায়দা করে

টাঙ্গা চালাচ্ছে। একজন লোক ওজন করার মেশিন নিয়ে রামকৃষ্ণনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'ওজন করাবেন বাবু?'

'না।'

'শুধু একটি পয়সা দেবেন।'

'না না।' রূঢ়তায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে লোকটির দিকে ঘুরে তাকায়। লোকটির মধ্যে ভাবান্তরের কোন চিহ্নমাত্র নেই।

রামকৃষ্ণন নির্বিকারভাবে বসে পড়ে পথের পাশে এক জায়গায়। মনে মনে ভীষণ চটে যায়, নিশ্চিন্তে কোথায় বসারও সুবিধা নেই এই দুনিয়ায়।

হঠাৎ একটি লোক তার পাশে এসে বসে পড়ে। লোকটা কোত্থেকে আর্বিভূত হলো কে জানে? মাটি ফুঁড়ে বেরুল না কি? রামকৃষ্ণন তার দিকে আড়চোখে তাকায়। লোকটা যোয়ান। মাথায় একটা গামছা বাঁধা। গেঞ্জীটা একটু নোংরা। আর পরনে তলা থেকে অর্ধেক ভাঁজ করা লুঙ্গি। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ব-সংসার যেন তার কাছে আমল পাবারই যোগ্য নয়। বসেই সে শিস্ দিতে শুরু করে, ব্যাটাচ্ছেলে যেন শিস্ দিতেই সেখানে বসেছে। কিছুক্ষণ শিস্ দেওয়ার পর দুটো বিড়ি বের করে একটা ঠোঁটের মাঝে চেপে ধরে, অন্যটা রামকৃষ্ণনের দিকে এগিয়ে ধরে।

'বিড়ি খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ।'

'অভ্যেস নেই বুঝি?'

'এখন খাবো না।'

'অ। তাহলে…আপনি'…

'হাঁ ?'

'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি থাকেন কোথায় ?'

রামকৃষ্ণন নিজের গাঁয়ের নাম বলে।

'কোন কাজে এসেছেন বুঝি ?'

'না।'

'তা হলে ?…এখানে ?'

'চাকরির খোঁজে।'

লোকটা মুচকি হাসলো আর খুব জোরে একবার বিড়িতে টান মেরে সব ধোঁয়া একসঙ্গে ছাড়লো।

'অ। চাকরিটা তাহলে পেয়েছেন নাকি ?'

'না।'

'অ। আপনার নাম ?'

'রামকৃষ্ণন।'

'এক্ষুনি চাকরি পাবেন।'

'আপনার পরিচয় ?' রামকৃষ্ণন জিজ্ঞাসা করে।

'আমার পরিচয় ?…তাহলে শুনুন। আমার নাম যোশেফ। বয়স আটাশ। বিয়ে-থা হয়নি। কয়েকদিন হলো চাকরি করছি। চাকরী বলা ভুল, ব্যবসা। বিজনেস খুব ছোট। তবুও লোকসান নেই।…আমি আপনাকে এই অফিসের সামনে বহুদিন দেখেছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', রামকৃষ্ণন উদ্বিগ্নভাবে বলে, 'কোথাও কিছু পাচ্ছি না।'

'অ।' যোশেফ কি যেন চিন্তা করে বলে, 'আচ্ছা আসুন চা খাওয়া যাক।'

'আজ্ঞে না থাক, ধন্যবাদ।'

'চা খাবেন না কেন? আরে ভাই আপনার মত আমার অনেক ভাই আছে, আমি বুঝি। চলুন এক কাপ চা খেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

যোশেফ রামকৃষ্ণনের হাত ধরে। সত্যি কথা বলতে কি এতে সে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। হঠাৎ এই ধরনের বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সে যেন খাপ খাওয়াতে পারে না। তবু তার সঙ্গে গেল। কিছুটা চিন্তা করার অবকাশ পাবে আর ক্ষিদেও কিছুটা মিটবে। আর চিন্তা করারই বা কি আছে? ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। চোর, জোচ্চোর, বাটপাড় যার সঙ্গেই ভীড়ে পড়ুক না কেন এখন আর হারাবার বা ভয় পাবার মত কিছু নেই। দুজনে এক চায়ের দোকানে ঢুকে।

'দুটো কড়া চা দাও তো। আর ভদ্রলোকের জন্য কিছু খাবার।'

'না না, ওসব কিছু চাই না।'

'একটু কিছু খেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

'আজ্ঞে খুব টাটকা খাবার আছে', দোকানদার বলে।

'যাও যাও, নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

দুটো প্লেট রামকৃষ্ণনের সামনে রাখা হল।

'তারপর, থাকেন কোথায়?'

'আমি···আমি'···রামকৃষ্ণন কিছুটা হকচকিয়ে যায়।

'থাকার তেমন কোন জায়গা নেই, এই তো বলবেন!'

'হ্যাঁ।'

'থাকার বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু? কিন্তু আবার কি?...ও, ভাড়ার কথা ভাবছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভাড়া দিতে হবে না।'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে থাকবেন। ফ্রি কোয়ার্টার!'

রামকৃষ্ণন যেন কিছুই বুঝতে পারে না।

'বেকার হওয়াটা পাপের কিছু নয়। যাক্‌গে ওসব। বাড়িতে আর কে আছে?'

'তেমন কেউ আপন লোক নেই। ...তবে হ্যাঁ একটিমাত্র বোন আছে।'

'একটা ব্যাপারে তাহলে আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। আপনার একজন কেউ আছে। আচ্ছা সে করে কি?'

'সে শ্বশুরবাড়িতেই থাকে।'

'তবু ভাল।'

ততক্ষণে দুজনের চা খাওয়া শেষ হয়েছে। ওরা আবার বেরিয়ে পড়ে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পথের ধার ঘেঁষে দুজনে অগ্রসর হতে থাকে।

'আমি......আমি......'

'আসুন না আমার সঙ্গে, দুজনে আজ এক সঙ্গেই থাকব।'

'তা........'

'ওসব তা-টা চলবে না। ভাববার কিছু নেই। আসুন।'

যোশেফ এগোতে থাকে। দুটো শহর পেরিয়ে গেছে তারা। মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার বাইরে চলে গেছে তারা। লোকের আনাগোনা সে পথে অনেক কম।

'আরো অনেক দূর বুঝি?' রামকৃষ্ণন জিজ্ঞাসা করে।

'না, এই তো এসে গেছি।'

তারপর সিকি মাইল হেঁটে যোশেফ এক মাঠে নাবে। আলো মোটেই ছিল না। তবুও টলতে টলতে রামকৃষ্ণন তার পেছনে পেছনে এগোতে থাকে। দু একটা মোড় ঘোরার পরে তারা একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। যোশেফ প্রথমে সেই ঘরের ভেতর ঢোকে—রামকৃষ্ণন তাকে অনুসরণ করে।

রামকৃষ্ণনকে নির্দেশ দিতে দিতে যোশেফ এগোতে থাকে। কোথায় চড়াই কোথায় উৎরাই, কোথায় পাথরের ঢিবি ইত্যাদি সব বলতে বলতে এগিয়ে যায়।

অবশেষে যোশেফ একটি মোমবাতি ধরায়। রামকৃষ্ণন দেখে তারা দুজনে এক বিরাট অট্টালিকার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে।

'এই বাড়ি?' রামকৃষ্ণন আশঙ্কার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ........এইটাই আমার কুটীর।'

'আপনার নিজের?'

'নিজের পরের এসব চিন্তা আমার মধ্যে নেই। আমার মতে সবই তাঁর।' কথাটা বলেই উৎফুল্ল হয়ে যোশেফ হেসে ফেলে।

'স্নান করবেন ?'

'না।'

'বেশ, তা হলে শোয়ার ব্যবস্থা করি।'

যোশেফ রামকৃষ্ণনকে অন্য এক কামরায় নিয়ে যায়। সেখানে অনেকগুলো বড় বড় কাঠের টুকরো পড়ে আছে। সেখান থেকে আবার আর এক ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে দু তিনটে চাটাই পড়ে আছে। যোশেফ কাঠের দু' তিনটে টুকরো নিয়ে এসে চাটাইয়ের তলায় বালিশের মত মত রাখে।

'এগুলো বেশ বালিশের কাজ দেবে। এখন আপনি বেশ আরামসে ঘুমোতে পারেন।'

রামকৃষ্ণন জামা খুলে ওপরে টাঙ্গিয়ে রাখে। মোমবাতি নিভিয়ে দেয়। সবাই নিশ্চুপ।

অদূরে পথে কাঠবোঝাই লরী যাওয়ার আওয়াজ ভেসে আসে। রামকৃষ্ণনের মনে হল সে লরীগুলো যেন তার বুকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপরেই সে উবুর হয়ে শুয়ে পড়ে।

'কি এখনও ঘুমোলেন না ? কি ভাবছেন ?' যোশেফ জিজ্ঞাসা করে।

'তেমন কিছু না।'

'আপনি কলেজে পড়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এইতো মুশকিল হল।'

'মানে ?'

'তেমন কিছু না। লেখাপড়া জানা লোকের আজকাল বেশী কষ্টভোগ করতে হচ্ছে।'

'অর্থাৎ ?'

'এই তারা মিছিমিছি অনেকক্ষণ চিন্তা করে। এই দুনিয়ায় বেশী চিন্তা করা খারাপ। খুব বেশী চিন্তা করতে করতে হয় আত্মহত্যা করে নতুবা আধপাগল বনে যায়। দুটোই বাজে। তাই না ?'

'তাহলে........আপনি লেখাপড়া করেন নি ?'

'না।........নিজের সংসারের কথা ভাবছেন বুঝি ?'

'না।'

'তা হলে নিজের সম্পর্কে ভাবছেন।'

'হ্যাঁ—না, নিজের সম্পর্কে নয়।'

'তাহলে কি সম্পর্কে ভাবছেন ?'

'এই বাড়ি ?' রামকৃষ্ণন হঠাৎ থেমে যায়।

'এই বাড়ি ? হয়তো কোন ভালো লোক বানিয়েছে। এ বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই বাড়ির কেউ মারা গেছে। সে মারা যাওয়ায় আমার খুব ভালোই হল। আরে দাদা, নিজে মরে অপরের উপকার করার মত লোকও দুনিয়ায় আছে।'

'কি রকম ?'

'সে মারা গেছে বলেই তো বাড়ির কাজ বাকী আছে। যতদিন এভাবে থাকে ততই ভালো। আমরা থাকতে পারব।'

'তারপর ?'

'তারপর ?.......কোন একজন কুবের আসবেই।'

'তখন তুমি ?'

'এ বাড়িটা হওয়ার আগেও এই শহরে ছিলাম। তখন আমি একরকম রাজার হালে থাকতাম। এর চেয়েও অনেক ভালো ছিলাম। ঘরে বসে বসেই জল পেতাম। এখানে তো পাতকুয়োটা বাইরে আছে। কি আর করা যায়, পড়ে আছি কষ্ট করে!'

'তারপর ?'

'কি আর বলব! ঐ ব্যাটাচ্ছেলেরা সে বাড়ির কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিল। কাজেই আমাকে সে বাড়ি ছাড়তে হল। দিনকয়েক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হল। তারপর এই বাড়িটা খুঁজে বের করেছি।'

'এ বাড়ির মালিক কে ?'

'দিনে যারা থাকতে চায় তারাই ওসব খোঁজ খবর রাখবে। আমি ওসব...'

'হুঁ।' রামকৃষ্ণন কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকে।

'এই ছাখ। আরে মশায় আপনি আবার ভাবতে আরম্ভ করলেন! এ বাড়ির কাজ পুরো হয়ে গেলে আর একটা খুঁজে বার করে নেওয়া যাবে। ভয়ের কি আছে ? এখনও ঐ বাড়িতে থাকতে পারি। তবে একটু দূর পড়বে, এই যা।'

'অন্য কোন বাড়ি হচ্ছে নাকি ?'

'বাড়ির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তবে ওবাড়িতে এখন অন্ততঃ কেউ থাকবে না।'

'কেন ?'

'শুনুন তাহলে বলি। ওবাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে কোন এক মেয়ের ভালবাসা ছিল। ছেলেটা শুধু বসে কবিতা লিখত। কাজকর্মের নামে অষ্টরম্ভা। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটি কোন এক বড় ব্যবসাদারের ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে।'

'তার প্রেমিক থাকা সত্ত্বেও ?' রামকৃষ্ণন আশ্চর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

'দেখুন, আমার মনে হয় ওসব কিছু নির্ভর করে মনের জোরের ওপর। মনের জোর যার যত বেশী তার ভালবাসার শক্তি তত বেশী। মনের জোর যার কম তার ভালবাসাও নড়বড়ে। হ্যাঁ আমি যা বলছিলাম, ছেলেটা শুধু কবিতা লিখতই না, কবিতায় বোঝা মগজের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। আসলে এসব লোকের মাথায় স্ক্রু ঢিলা থাকে! কাজেই মেয়েটির এই বেইমানির শোধ নেওয়ার জন্য সে সেই বাড়িতে আত্মহত্যা করে বসে। লোকের মুখে যা শুনতে পাই যুবকটির প্রেতাত্মা নাকি ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মতে ভাই প্রেতাত্মা থাকলে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই আছে। সে যাই হোক, আমরা তো এখানে থাকার মওকা এখন পেয়েছি!'

কিছুক্ষণ রামকৃষ্ণন নিশ্চুপ থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে ?'

'হ্যাঁ, বেঁচে তো আছেই, উপরন্তু ছেলেপুলে নিয়ে বেশ সুখেই আছে।'

'হুঁ!' রামকৃষ্ণন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

'কাল-পরশুর মধ্যে আপনার চাকরি ঠিক হয়ে যাবে।'

'কে জানে···ভাল কথা, আপনি তো বিজনেসের কথা পরিষ্কার করে কিছু জানালেন না।'

'বলার মত তেমন কোন বিজনেস নয়। পরশু আট আনা পেয়েছি, কাল পেয়েছি বারো আনা। আজ আরো বেড়েছে, পুরো পাঁচসিকে রোজগার হয়েছে।'

'কী সে বিজনেস?'

'এই কুকুর-ধরা বিজনেস আর কি।'

'কি বললেন?' রামকৃষ্ণন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'এই শহরে বিনা লাইসেন্সের অনেকগুলো কুকুর আছে। সেগুলোকে ধরে ধরে মিউনিসিপ্যালিটিতে দিলে পকেটে নগদ-নারায়ণ বেশ কিছু আসে। কুকুর পিছু চার আনা।'

'ও!···এই আপনার বিজনেস!'

'হ্যাঁ।'

'সবদিন কি আর কুকুর ধরা যায়?'

'তা যাবে না কেন, বলি, যা আছে সেগুলো তো আবার বাচ্চাটাচ্চা দিচ্ছে!···কিন্তু ভাই আমি ভাবছি বিনা লাইসেন্সের মানুষগুলোকে ধরার আইন-কানুন বেরুলে দু'চার পয়সা আরো বেশী আসত।'

কি জানি কেন, এই অবস্থায় ওকথাগুলো রামকৃষ্ণনের মনে বেশ একটা কৌতুকের আমেজ এনে দেয়। তুজনেই হো হো করে হেসে ফেলে। তারপর তুজনেই নিশ্চুপ হয়ে যায়। কথাবার্তা বেশীদূর আর এগুলো না। সারাদিন ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে এল। তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ভোরেই যোশেফ রামকৃষ্ণনের ঘুম ভাঙায়। তুজনেই স্নান করার পর বেরিয়ে পড়ে।

যোশেফ নিজের ডিউটিতে বেরিয়ে পড়ে। বেরোনোর সময় রামকৃষ্ণনের হাতে পাঁচ গণ্ডা পয়সা গুঁজে দিয়ে বলে, 'তুপুরে হোটেলে ভাত খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যার সময় গতকাল যেখানে দেখা হয়েছিল সেখানে দেখা করবেন।'

এইভাবে তাদের জীবনপঞ্জিকায় অনেকগুলো পাতা মহা-কালের বুকে পড়ে। এই সময়ের মধ্যে আস্তানা তাদের বদলাতে হয়েছে। তুজনে সেই প্রেতাত্মা-বাস-করা ঘরে থাকে। রাম-কৃষ্ণনের মূল কাজ ছিল বিভিন্ন আপিস-আদালতে সিঁড়ি বেয়ে উঠা আর নামা। প্রত্যেকটি জায়গা থেকে সে পায় একই জবাব,—'নো ভেকেন্সী!' সে ভাবে, যুদ্ধটুদ্ধ বাধলে কত সুন্দর হত। চাকরি একটা নিশ্চয় মিলত।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় যোশেফ ফিরে এসে শোনায় তার বীরত্বের গাথা।

'ভাই, আজ এ্যায়সা একটা কুকুর ধরেচি না, শালা যেন বাঘের বাচ্চা! এ মিঞাও ছাড়বার পাত্র নয়। আর ছাড়ি বা

কি করে বল? ছাড়া মানেই তো নগদ চার আনা পয়সা হারানো। শেষ পর্যন্ত ধরেছি ঠিক ঘাড় মটকে।'

রামকৃষ্ণন যোশেফের ঐ বীরত্বের গল্প কান পেতে শুনত। আগাগোড়া 'হ্যাঁ হুঁ' করে যেত। গল্পের শেষে জিজ্ঞাসা করত, 'যোশেফ, এইভাবে আর কত দিন চলবে বলতে পার?'

'তুমি বাইবেল পড়েছ?'

'বাইবেল?'

'হ্যাঁ, ভাই, বাইবেল।'

'কেন?'

'ভগবান সেখানে কি বলেছেন?'

'ভগবান তো সেখানে অনেক কিছু বলেছেন।'

'আমাদের সম্পর্কে কি বলেছেন বলতে পার? পাখিদের দিকে তাকাও, তারা বীজ বোনে না, ফসল কাটে না, ধানও গোলায় জমায় না। স্বর্গের পিতা তাদের পালন করে। এই তো সেখানে ভগবান বলেছেন!'

'ওসব কথা পাখিদের বেলায় খাটতে পারে। কিন্তু মানুষের খাওয়ার জন্যে বীজ বুনতেই হয়।'

'কিন্তু এ ব্যাপারেও ভগবানের উপর ভরসা তো রাখতেই হয়।'

'কেন জানি না, আমার ভগবানের উপর ভরসা নেই।'

'আমার আছে, আমি ঠিক বাঁচব।'

'আমার কিছু ভাল লাগছে না, ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'এসব কথা বলা তোমার সাজে না। কুকুর, শেয়াল যা হোক একটা কিছু ধরেও আমাদের বাঁচতে হবে। কুকুর না পাওয়া গেলে আর কোন জানোয়ারকে ধরে বাঁচতেই হবে। প্রয়োজন হলে মানুষ ধরতেও কশুর করব না। বাঁচতে হবে তো!'

কিছুক্ষণ রামকৃষ্ণন নীরব থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা বেঁচে আছি কেন তাও তো আমাদের জানতে হবে?'

'আমরা আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবরে আমাদের কি লাভ?'

'কিন্তু যোশেফ, জীবনের তো একটা প্রতিষ্ঠা বলে জিনিস আছে। এবং তার জন্য প্রয়োজন ভিত্তির।'

'আমি তা মানি। কিন্তু আমাদের পক্ষে ওসব সাত-পাঁচ ভাবা মানেই আত্মহত্যা করা।'

এইভাবে যোশেফের ভরসায় রামকৃষ্ণনের দিন কাটে। বার বার কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাদের। প্রত্যেক দিন কুকুর জোটে না। অলিগলির মুখে ফাঁদ নিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটায় কুকুর ধরার জন্য। ঠায় অনেকক্ষণ বসার পর বিরক্তি বোধ করে, তারপর উঠে ফিরে যায়। চা খেয়ে ফাঁদের দড়িটি ঘুরোতে ঘুরোতে আস্তানায় ফেরে মনকে প্রবোধ দেয়, সে দিনটা ছুটির দিন ধরে নেয়। চাকরিতে তো মাঝে মাঝে ছুটি থাকে!

কিন্তু এক নাগাড়ে তিন দিন কুকুর না পাওয়া গেলে মনকে প্রবোধ দেওয়ার মত আর কিছু থাকে না তার। একদিন নিরাশ

হয়ে ফেরার পথে হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। এক অপকর্ম করে বসে।

এই নতুন কাজে ঝুঁকি আছে। লাইসেন্সওয়ালা কুকুর ধরে, তার লাইসেন্স ছিঁড়ে ফেলে মিউনিসিপ্যালিটিতে জমা দেয়। একদিন এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে যায় যোশেফ।

আত্মপক্ষ সমর্থনের মত যোশেফের হাতে কিছু ছিল না। কুকুরের মালিক তাকে চুল ধরে পথে ফেলে প্রচণ্ড প্রহার করে। ভীড় জমে যায়। পুলিস আসে, ভ্যানে করে নিয়ে যায় তাকে, পুরে দেয় হাজতে।

বিচার হয়। আসামীর কাঠগোড়ায় যোশেফ দাঁড়ায়। উকিল জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কুকুর চুরি করেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' যোশেফ স্বীকার করে।

এর আগে যতগুলো লাইসেন্সওয়ালা কুকুর চুরি গেছে তার সবগুলোর চোর যোশেফ—বিচারের রায়। তাছাড়া অন্য ধরনের চুরির ব্যাপারেও যোশেফকে সন্দেহ করা হয়। উকিল জিজ্ঞাসা করে—'তুমি তাহলে সেদিন নারকেল চুরি করেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চেয়ার চুরির কেসেও তুমি ছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাঁচটা প্রাইভেট চিঠি থাকা যে ভ্যানিটী ব্যাগটি চুরি গেছলো, তাও কি তোমার কাজ ?'

'সেটা আবার কি জিনিস ?'

'ভদ্রমহিলাদের হাতে থাকা ছোট বটুয়া।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি করেছি।'

'ঐ প্রাইভেট চিঠিগুলো সব কোথায় ?'

'আমি নিয়ে নিয়েছি।'

'নিয়েছ বুঝলাম, কিন্তু সেগুলো কি করলে ?'

'সেগুলো······কিছুই না।'

দর্শকদের মধ্য থেকে হঠাৎ এক যুবতী ফুঁপিয়ে কেঁদে চিৎকার করে ওঠে, 'পাজী, বদমাশ, জোনির সব চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেললে !'

তারপর কে একজন তাকে সান্ত্বনা দিতে বাইরে নিয়ে যায়।

'সে চিঠিগুলো কি তুমি পড়েছিলে ?'

'আজ্ঞে আমি ইংরিজী পড়তে পারি না !'

'কিন্তু সেগুলো ইংরেজী লেখা ছিল না।'

'ও তাই নাকি। হতে পারে।'

উকিল মশায় দারুণ চটে যায়। তারপর আরও কয়েকটা প্রশ্নবানে তাকে বিদ্ধ করে। সবশেষে যোশেফ বলে, 'আদালতের কাছে আমার একটি আরজি আছে।'

'পেশ করতে পার।'

'কমপক্ষে মাস ছয়েক এই বিচার চলুক।'

'কেন ?'

'কারণ এর মাঝে যতগুলো চুরিচামারি হবে, তার জন্যে অন্য কাউকে খুঁজে বের করতে হবে না।'

এই কথায় উকিলের মুখেও হাসি ফোটে। কিন্তু অভিযোগ করে—এই ধরনের কথায় নাকি আদালতে সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত তার সাজা হয়, তিরিশ টাকা জরিমানা বা এক মাসের জেল। যোশেফ টাকা দিতে পারেনি, কাজেই জেলে যায়।

রামকৃষ্ণনের মুখ চুন হয়ে যায়। আদালত থেকে বেরিয়ে নিজেকে বড় একা লাগে তার। মাথা নিচু করে পথের পাশ দিয়ে খুব জোরে হেঁটে চলে সে। শহরকে পেছনে ফেলে প্রান্তরের পথে চলে। কোথায়? সে তা জানে না। রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে সে এগিয়ে যায়। অবশেষে ক্লান্তি আর আর অবসাদে কোন এক দোকানের বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে।

একমাস খুব তাড়াতাড়ি যেন কেটে যায়। ব্যস্ততামুখর শহরের মানুষ ভুলে যায় সংবাদপত্রের আইন-আদালতের স্তম্ভে পড়া যোশেফের কথা। ঠিক এই সময়ে সে ফিরে আসে। মুখে তার কোন চিন্তার খাঁজ পড়েনি। আগের মতই আছে। স্বাস্থ্যটাও যেন কিছুটা ভাল হয়েছে।

যোশেফ রামকৃষ্ণনকে খোঁজে। কোথাও তার পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার আশঙ্কা হল বুঝিবা সে আত্মহত্যা করেছে। হঠাৎ একদিন তার এক পুরনো হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কথায় কথায় সে যোশেফকে ঠাট্টা করে বলে—'কি, তুমিও তোমার বন্ধুর লাইন ধরবে নাকি?'

'কোন বন্ধু?—কি লাইন?'

'রামকৃষ্ণনের।—সে এখন পাগলা গারদে আছে।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ।'

যোশেফের গলা ভারি হয়ে গেল। খুব ব্যথা পেল সে। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল পাগলা গারদে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে রামকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল।

রামকৃষ্ণন সেখানে ঠাঁয় বসে ভগবানের বাণী আউড়ে যাচ্ছে। গলায় লাল ফুলের মালা। যোশেফকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে, 'কে যোশেফ?'

যোশেফ হক্‌চকিয়ে যায়। তার আশঙ্কা ছিল রামকৃষ্ণন হয়তো তাকে চিনতে পারবে না।

'কখন ছাড়া পেলে ভাই।'

'হপ্তাখানেক হল।'

'এখন কোথায় আস্তানা গেড়েছ, সেই প্রেতের ঘরে?'

'কোথায় আর গেড়েছি!'

'তারপর কি ঠিক করলে?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি রামকৃষ্ণন।'

'পাগল হয়ে গেছি কিনা জিজ্ঞেস করতে চাইছ না যে। ....ভেবে চিন্তে দেখলাম সারা দুনিয়াটাই যখন পাগল হয়ে গেছে তখন পাগল না হলেও হওয়ার বাহানা করা ভালো।'

'কেন?'

'কেন আবার? এখানে দুবেলা দুমুঠো খেতে তো পাচ্ছি। এই বেশ আছি!'

'রামকৃষ্ণন, এ তুমি কি বলছ বল তো ?'

'ঠিকই বলছি ভাই, এখানে খুব শান্তিতে আছি। এখানে উপর তলার আর নিচের তলার মানুষের ভেদাভেদ নেই। আর সাথীরাও বেশ রসিক। যেন তেন প্রকারেণ তুমুঠো গিলতে পারলেই হল........ঐ আবার ডাক্তার আসছে। এক্ষুণি আমাকে পাগল সাজতে হবে। আবোলতাবোল বকতে হবে, লাফাতে হবে, আরো কত কিছু........'

রামকৃষ্ণন নাচতে শুরু করে। অদ্ভুত বিচিত্র এক পাগলের নাচ! ডাক্তার ওদিকে যেতে যেতে অন্য দিকে ঘুরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নাচও থামে।

'এ সব ?' যোশেফ জিজ্ঞাসা করে।

'ঠিকই করছি যোশেফ। বাঁচতে চাও তো তুমিও এই পাগলা গারদে ঢুকে পড়।'

'না এটা পাপ !'

'অন্যগুলো কি পাপ নয় ?'

একথার পর তুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর যোশেফ বলে, 'আমি যাচ্ছি।'

'যোশেফ !' রামকৃষ্ণনের গলা ভারি হয়ে যায়।

'আমি যাচ্ছি, কোথাও না কোথাও বিনা লাইসেন্সের কুকুর মিলবেই। সেগুলোই ধরে আমি বাঁচব।'

তারপর এগিয়ে যায় যোশেফ। মুহূর্ত্তকাল পরে কি যেন ভেবে নিয়ে রামকৃষ্ণনও জোরে পা চালিয়ে তাকে অনুসরণ করে।

যোশেফের ভাগ্যে গির্জা

কে. সি. কে. পানিক্কর

এতদিনে যোশেফ মনে সান্ত্বনা পেল। বড় গির্জায় ঢুকতে না দিলে আজ আর সে পরোয়া করবে না। নিজের গাঁয়ের গির্জায় সে যখন খুশি যেতে পারবে। ছোট একটি কাপড় গুটিয়ে নিয়েও গাঁয়ের গির্জায় যেতে পারবে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করে ফিরতেও পারবে। যোশেফের গাঁয়েই নতুন গির্জা হচ্ছে।

পাইলুনি, তোমা, পরিঞ্জুনী এই তিন ভাইয়েরই টাকার অভাব নেই। তারাই গির্জা নির্মাণের উদ্যোক্তা।

'ভাই পরিঞ্জুনী, ভালো পাকা ইট কোথায় পাওয়া যায় বল তো?'

'কুকর্ণ পার্কলে।'

'কিন্তু, সহতীর সার্গোনের ইট কি রকম?'

'সেগুলো তো ভালোই।' একজন বলল।

'কই, আইপ্পন রাজমিস্ত্রিটাতো এল না এখনো।'

'তাইতো, এদিকে জর্জ ভাইও তো আসেনি।'

'পুলের কাছে কাউকে পাঠিয়ে দাও। সেখানেই তার বাড়ি।' তাদের কথা চলল আরো কিছুক্ষণ।

'হাঁ করে দেখছ কি? এদিকে চুন আরো ভালো করে লাগাও।'

'ভাই যোশেফ, তুমি একটু এদিকে এস তো।'

গাঁয়ের প্রবীণ ব্যক্তি বলে যোশেফকে তারা 'ভাই' বলে সম্বোধন করে। যোশেফ আরো কাজের প্রেরণা পায়। দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যায়। খাওয়ার প্রতি লক্ষ্য নেই। মাঝে মাঝে শুধু ঢকঢক করে জল খায়। গির্জার কাজ ফুরিয়ে আসে। তার জীবন-দীপের তেলও যেন ফুরিয়ে আসে। চোখ কোটরস্থ হয়। মুখ লম্বা দেখায়।

এইভাবে দ্রুতগতিতে কাজ অগ্রসর হয়ে নারকেল গাছে-ঘেরা কুঞ্জবন কেরলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে নতুন গির্জা গড়ে উঠল।

প্রথম রবিবার এল নতুন গির্জার জীবনে। একে একে বেশ কয়েকজন রঙচঙে কোট-প্যান্ট পরল। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নারকেল তেল মেখে চুল আঁচড়ে প্রভাতী সূর্যের আলোকে এগিয়ে এল। সবাই চলেছে গির্জার দিকে, যেন সুন্দর এক সুসজ্জিত মিছিল।

যোশেফ সেদিন ভোর পাঁচটায় উঠল। আজ থেকে ঠিক ছটি বছর আগে নোংরা কাপড় পরেছিল বলে তাকে ঘাড় ধরে গির্জার বাইরে বার করে দিয়েছিল যীশুখৃষ্টের পরম পূজারীরা!

এই ঘটনার পর যোশেফকে আর কোনদিন গির্জার দ্বারে মাথা কুটতে দেখা যায়নি।

আজও যোশেফের অভাব একই ভাবে আছে। গত 'য়োনাম্' উৎসবের সময় কুঞ্জীমেনন একটি দামী কাপড় দিয়েছিল। আজ সে কাপড়ের রং বদলে গেছে। নোংরা হয়েছে খুব। যোশেফের

আশা ছিল গির্জার কাজ শেষ হলে শেঠ পরিঞ্জুনীর কাছ থেকে অন্তত একটি কাপড় পাবে। পরে মনে মনে ভাবল গির্জা তো আর একা পরিঞ্জুনীর নয়—তাতে তারও ভাগ আছে। বেচারা পরিঞ্জুনীও তো কত কষ্ট ভোগ করেছে। সময়মত খায়নি। কত দূর দূর থেকে টাকাপয়সা সংগ্রহ করে এনেছে। লটারিও করতে হয়েছে।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে যোশেফ যেন কাপড়ের অভাব তখনকার মতন ভুলে থাকে।

পরিঞ্জুনীর নিজের প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, গির্জার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার একতলা বাড়িটি দোতালা হল। একটি ছোট্ট বাগান-বাড়ি হল। একমাত্র আদুরে কন্যা মরিয়ার বিয়েও এই মরশুমে চুকে গেল।

সেই প্রথম রবিবার গির্জায় গাঁয়ের সকলে সম্মিলিত হল। যোশেফ নিজের পুরনো প্রার্থনার বই বগলে করে আনল। বিগত ছটি বছরের পুঞ্জীভূত পাপ আজ সে ধুয়ে মুছে ফেলবে। বাবার ঐ ধরনের পোশাক আর চালচলন এলুয়ার ভালো লাগল না। এলুয়া যোশেফের মেয়ে হলেও গির্জায় যাবার কাপড়-জামা অন্তত পরিষ্কার রাখে।

'বাবা তুমি এইভাবে গির্জায় যেয়ো না।'

'দেখ এলুয়া, তুই যা করছিস কর, আমার কাছে বক্‌বক্‌ করিসনি, আমি কোন বিয়ে-শাদি করতে যাচ্ছি না'—যোশেফ ভীষণভাবে চটে গিয়ে এলুয়াকে বকুনি দিল।

এলুয়া শব্দটি করল না।

পরিঞ্জুনী তার দু'ভাইসমেত হাসিমুখে গির্জার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। শীতের দিন। একে একে গির্জায় লোক ঢুকল—যোশেফও গির্জার দরজায় পৌঁছে উজ্জ্বল চোখে কিছুক্ষণ দেখে ঢুকতে যাচ্ছিল এমন সময় পরিঞ্জুনীর ভাই পাইলুনি যোশেফকে বাইরে ডেকে, 'তুই কি এখানে ইট বইতে এসেছিস?' বলে ঘাড় ধরে তাকে গির্জার বাইরে ফেলে দিল। এই ঘটনা গির্জার যাত্রীরা হয়তো কেউ দেখেনি, কিন্তু দেখেছে ভোরের আকাশে পূর্বদিগন্তে ওঠা লালটুকটুকে সূর্য। তুফোঁটা জল ফেলে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে—সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন নালিশ জানাল যোশেফ।

সেদিনের আঘাতের পরে যোশেফের জ্বর এলো। দু'চার দিনেই হাত-পা সরু হয়ে গেল।

এল্য়া মেয়েটি নজরে পড়ার মত। পরিঞ্জুনীর কৃপাদৃষ্টি পড়ল তার উপরে। যোশেফকে বলে কয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য তাকে নিজের বাড়িতে রাখতে রাজী করাল। পাঁজির অনেক পাতা উড়ে পড়ল মহাকালের বুকে।

যোশেফ প্রত্যেক রবিবার গির্জার সামনে প্রভাতী সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করত। ভেতরে যেত না কোনদিন, প্রার্থনা শেষে ফিরে যেত নিজের কুঁড়ে ঘরে। এই ভাবে কেটে গেল দীর্ঘ সাতটি বছর।

একদিন পরিঞ্জুনী যোশেফের বাসায় এল। গির্জা তৈরীর আগে সেই কবে একদিন এসেছিল কাজ করাতে। আজ

পুরনো চেয়ার এনে যোশেফ বসাল পরিঞ্জুনীকে। চেয়ারের একটি পা ভাঙা ছিল। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঠিক করে দিল যোশেফ।

'ভাই যোশেফ, এইভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি দিন চলবে? বলি, বাপ-মার একটা কর্তব্য তো আছে। তোমার মেয়ে বড় হয়ে এল, বিয়ে আর কবে দেবে?'

কথাটি শুনে যোশেফের চোখ ফেটে জল এল—'ঠিকই বলছেন।'

পরিঞ্জুনী আবার বলে, 'অত ভেঙে পড়ার কী আছে ভাই! আমার ছোট ভাই বরতুর ছেলে পাস-টাস করে ফিরেছে। ভাবছি তার সঙ্গেই তোমার মেয়ের······তারাও রাজী আছে।'

'কিন্তু টাকা-পয়সা?' এই কথা বলে যোশেফ পরিঞ্জুনীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'তুমি ওসব বিষয় ভেবো না, আমি কাল আসব।'

কথাটি শেষ করে পরিঞ্জুনী চলে গেল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোশেফ সেখানেই বসে পড়ল।

যোশেফের বাড়ির সামনে সুন্দর সুসজ্জিত বিয়ের আসর। এলুয়ার বিয়ে হল। খরচ সব পরিঞ্জুনীর।

কয়েক মাস কেটে গেল। এলুয়া আজ গর্ভবতী। বিয়ের সাত মাস পরে এলুয়া প্রসব করল একটি স্বাস্থ্যবান শিশুকে। তাজ্জব ব্যাপার, দশ মাসের শিশুও এত স্বাস্থ্যবান হয় না!

শিশুটিকে দেখতে এসে মহিলারা কানা-ঘুষা করতে লাগল। একজন তো প্রায় বলেই ফেলল 'বাচ্চাটি দেখতে যেন পরিঞ্জুনীর মত।'

'এসব তুই কি বকছিস, ওসব হল বড়লোকের ব্যাপার!'

বছর কেটে গেল। যোশেফের বয়স বার্ধক্যের শেষ সীমান্তে। তবুও সে লাঠি ধরে গির্জায় যেত। বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করত। তার একটি মাত্র ইচ্ছা গির্জার ভিতরে যাওয়া। আজও সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

আর মাত্র দুদিন পরে যোশেফের নাতীর অন্নপ্রাশন। গির্জায় কিভাবে যাবে, আজ প্রথম চিন্তায় পড়ল যোশেফ। ভাল কাপড় চাই। জামাই তো সবকিছু জানে, ও নিশ্চয় আজ একটা কিছু দেবে। আজ নাহোক কাল জামাই শহর থেকে ফিরবেই। এই সব আশার আলো তখনও তার মনে মিটমিট করে জ্বলছিলো।

অন্নপ্রাশনের দিনও এসে গেল, কিন্তু তখনও মেয়ের স্বামী গাঁয়ে পৌছায়নি।

ভোর তখন হয়নি। যোশেফ উঠে পড়ল। ঘুমায়নি সারা রাত, ছট্‌ফট্‌ করছিল তার মন। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। হয়তো সে ভুলের জন্য পরিঞ্জুনী দায়ী। হয়তো বা তার জামাই অথবা সে নিজেই।

ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক পৃথিবীর দিকে চেয়ে চীৎকার করে মেয়েকে ডাক দিল—'এল্‌য়া?'

'যাই বাবা।'

'জল...'

এল্য়া জল আনল। কিন্তু সে জল আর মুখে দিতে পারল না!

বাঘা

ভি. এম. বশীর

বাঘা একটি কুকুরের নাম, খুব ভাগ্যবান। সেবার আকালে গাঁ-কে-গাঁ যখন উজার হবার উপক্রম, লোকে যখন ভাত তো দূরের কথা, ফেনও পায় না, তখনও এই বাঘার চেহারা বেশ নাদুস-নুদুস ছিল। তার বসা অবস্থায় মনে হত যেন একটি মোটা কালো কম্বল পড়ে আছে। ভাগ্যিস পা আর ন্যাজটা সাদা ছিল। চোখ তার বাঘের মতনই লাল। অনেকে বলে তার চোখ পুলিসের মত।

বাঘা বিলিতি কুকুর নয়, দেশী কুকুরই। শহরেরই কোন এক আস্তাকুঁড়ের পাশে তার জন্ম। একটু বড় হবার পরেই থানার কাছে কাছেই ঘুরে বেড়াত। তাকে আদর করার লোক পুলিস আর আসামী। কুকুরটি মানুষ চিনত। তাই, পুলিস ইন্সপেক্টরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছে ছুটে যেত।

বাঘার চোখে আসামীরা সব সমান। খুনী, চোর, ডাকাত, রাজবন্দী যেই হোক না কেন, তার চোখে সবাই সমান। তার চোখে মানবজাতি দুটো ভাগে বিভক্ত, পুলিস আর আসামী। হাজত-ঘরের আজকের পঁয়তাল্লিশ জন আসামীই তার চোখের সামনে। চার জন আসামী আলাদাভাবে এক ঘরে আবদ্ধ, এরা

রাজবন্দী, কিন্তু বাঘা তাদের আলাদা করে দেখে না ; তার চোখে সব হাজত-ঘরই সমান। কোন হাজত-ঘরেই আলো উঁকি মারতে পারে না। ঘরগুলো অন্ধকারে ঘুটঘুট করে। এই ঘরে কঙ্কালের মত কতকগুলো লোক পড়ে থাকে। পায়খানা পেচ্ছাবের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ছারপোকাও থাকে প্রচুর। তবুও তারা পড়ে থাকে ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে।

ওসব গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলেও সেদিকে আসামীদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তাদের একমাত্র চিন্তা খাওয়ার— পেটের চিন্তা। রাত্রে ঘুমোয় সকালে খেতে পাওয়ার আশায়। কারো ক্ষিদে কোন সময়ে মেটে না। সবাই চায় সেই নরককুণ্ড থেকে বরং জেলে যেতে। দোষী সাব্যস্ত হবার পরেই জেলে পাঠানো হয়। জেল কয়েদীদের পক্ষে স্বর্গ, আর হাজতে থাকা নরকবাস।

প্রত্যেক আসামীর চোখ রুদ্র রোষে ভরা। তারা রক্তচক্ষু দেখায় বাঘার দিকে, কিন্তু বাঘা তাদের পরোয়া করে না। সে গম্ভীরভাবে হাজতের ডাইনে বাঁয়ে ঘোরে আর মাঝে মাঝে তার সামনে শুয়ে লেজ নাড়ে। আর ইন্সপেক্টরের খাওয়ার সময় তার কাছে হাজির হয়। খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলে ইন্সপেক্টর বাঘাকে ইশারা করে। বাঘা তার পাতে পড়ে—থাকা খাবার খায়। বাঘার খাওয়া দেখে আসামীদের জিভে জল আসে।

খাওয়ার পরে কাছের গাছতলায় বসে আলসেমি মিটিয়ে নেয়। তার পরেই সে হাজতের কাছে এমনভাবে আসে যেন কোন আসামীর কি কসুর তা জানে। কেউ হয়তো জীবনে

সেই প্রথমবার চুরি করেছে, কিন্তু ধরা পড়ার পরে সেই গাঁয়ে আগে যত চুরি হয়েছে সব দোষ চাপানো হল তার ঘাড়ে। মার খাবার ভয়ে ইন্সপেক্টর যা বলে ওরা তাতেই রাজি হয়ে যায়। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও পুলিস ইন্সপেক্টর থাকে।

সরকারের পক্ষ থেকে কয়েদীদের পেছনে খরচ করার একটা অঙ্ক থাকে। কিন্তু একজন ইন্সপেক্টরের আয় তার তিরিশ গুণেরও বেশী। এছাড়া উপরি তো আছেই।

হাজতে খাবার নিয়ে আসামীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বাইরে বাঘা শুয়ে শুয়ে মজা দেখে, যেন ভাবে—'এই তো এদের জীবন, এরা এইভাবেই থাকবে, এরা আসামীর জাত।'

প্রথম প্রথম কেউ বলত, 'আমার খিদে মিটছে না, সরকার আমার খাবার জন্য যে পয়সা দিয়েছে তা আমাকে দিয়ে দিন, আমি খাবার আনাব।'

কিন্তু প্রতিদানে পায় পুলিসের ঘুষি আর ইন্সপেক্টরের বুটের গুঁতো। শুধু তাই নয়, ইন্সপেক্টর গর্জে ওঠে বলত, 'সরকার তোর খাবার পয়সা দিয়েছে, সরকার তোর বাবা হয়?' লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে রক্তচক্ষু করে সবাইকে প্রশ্ন করে, 'সরকার তোদের বাবা হয়?' সবাই থর থর করে কেঁপে উত্তর দেয়. 'না স্যার, সরকার তো আমাদের বাঘা।'

'কি, এই প্রশ্নের এই উত্তর?' গর্জে ওঠে ইন্সপেক্টর।

সরকারের দেওয়া পয়সা ইন্সপেক্টর তার এক বন্ধু হোটেল-ওয়ালাকে দেয়। আসামীদের খাওয়ানোর ভার তার। একদিন না খাওয়ালেও কেউ রা শব্দটি কাড়তে পারে না। সাহসে বুক

বেঁধে কোন কয়েদী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করলে সেদিন তার ভাগ্যে রাম-ধোলাই থাকে।

ইন্সপেক্টর হাজতের কাছে এসে মুচ্‌কি হেসে বলে, 'আরে এই তুই আজ নালিস করেছিস না?······ভালো।'

তারপর তার জ্ঞান হারানো পর্যন্ত ধোলাই খেতে হয়। কাজেই কয়েদীদের কোন নালিশ থাকে না। রাগ থাকে। তারা বদলা নেয় সুযোগ পেলে বাঘার ন্যাজ ধরে টেনে ছুটো লাগিয়ে দিয়ে। ব্যাপারটি জেনে বাঘার প্রতি এই অবিচারে ইন্সপেক্টরের মেজাজ বিগড়ে যায়। বেত হাতে করে হাজতের কাছে এসে আসামীদের জিজ্ঞেস করে, 'বাঘা কাঁদছিল কেন, এঁ্যা। ফের যদি বাঘার গায়ে হাত দিয়েছিস কি তোদের পিঠের চামড়া তুলে দেব! বুঝলি?' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পেয়ে হাজত খুলে সপাং সপাং করে বেত মারতে থাকে। সকলের এক সঙ্গে কান্নার একটা সকরুণ আর্তনাদ হাজতের ভেতর থেকে আসে। আসামীদের গা থেকে টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত ঝরে। বাঘা সে রক্ত চেটে নেয়।

আসামীরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে। আঘাতে আঘাতে তাদের গা-সয়ে যায়। ওরা মার খায়। ওদের রক্ত ঝরে। বাঘা সে রক্ত চেটে নেয়।

বাঘা কোনদিন থানা থেকে দূরে যায় না। এত ভীরু, তবু থানার কাছে অন্য কোন কুকুর এলে ঘেউ ঘেউ করে। সে সময় বাঘা যেন সত্যই বাঘের জোর পায়। কিন্তু থানার বাইরে হাড্ডিসার কুকুরকে দেখেও তার ন্যাজ ভেতরে ঢুকে যায়। আস্তে

আস্তে জড়োসড়ো হয়ে সে থানায় এসে ঢোকে। বাঘার এই কাণ্ড দেখে একবার এক রাজবন্দী মন্তব্য করেছিলেন, 'দেখলে তো, আমাদের ইন্সেপেক্টর সাহেব চলে আসছেন।'

কথাটি শুনে দার্শনিক আসামী বললে, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই ধরনের ইন্সপেক্টর!' এই কথার উপরে তুমুল তর্ক হয়। তিনজন একদিকে আর উনি অন্য দিকে। ঠিক এই সময় ইন্সপেক্টরের আওয়াজে তাদের তর্ক থেমে যায়।

'কি ব্যাপার, এত হৈ চৈ কেন?'

কেউ রা শব্দটি কাড়ল না, সবাই নিশ্চুপ।

'খোল!'—ইন্সপেক্টর পাহারাদার পুলিসকে হুকুম দেয়।

পুলিস হুকুম তামিল করে। ঐ চার জন বাইরে আসে।

সে দিন রাত দশটার সময় হঠাৎ বাঘার ভীষণ চিৎকার শোনা যায়, সারা থানাটি যেন টলতে থাকে। পাহারাদার দেখে দুজন আসামী বাঘার মুখ চেপে ধরে ধাঁই ধাঁই করে পিটছে। দুজন ছিল, কিন্তু পাহারাদার চিনত একজনকেই।

ইন্সপেক্টর সেই আসামীকে টেনে বাইরে এনে চোখের কাছে ধাঁই করে ঘুষি জাগায়। তারপরই কিল, ঘুষি, লাথি সমানে চলতে থাকে। লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তবু চলে বুটের গুঁতো। চুল ধরে টেনে দাঁড় করায়, মুখ থ্যাবড়া হয়ে গেছে। সারা মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে। মেঝেতে কয়েকটা ভাঙা দাঁত পড়ে থাকে।

এই সকরুণ দৃশ্য দেখে চুয়াল্লিশ জন আসামী এবং পুলিস। আর বাঘা ন্যাজ নাড়তে নাড়তে সেই ঝরা রক্ত চাটতে শুরু করে।

ইন্সপেক্টর গর্জে জিজ্ঞেস করে, 'বল, আর কে ছিল ?'

কিন্তু সে বলেনি। কেন বলবে ?

তখন তার দুটো পা হাজতের শিকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে সজোরে তার পায়ে চাবুক মারতে থাকে। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরোতে থাকে। তবু সে নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ, কঠিন। তারপরেই সে জ্ঞান হারায়। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। পায়ের তলা দিয়ে রক্ত ঝরে। বাঘা সে রক্ত চুক্ চুক্ করে চাটতে থাকে !

●

পাগলা কুকুর

এস. কে. পোট্টেক্কাট

পুব দিগন্তে সোনালী আলো ছড়িয়েছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। কিরণ তখনও ছেঁড়া মাদুরের ওপরে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে আছে। ঘুম তার ভেঙে গেছে অনেক আগেই। তবু সে পড়ে আছে ব্যাঙের মত ঘাপটি মেরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ঠিক এইভাবে পড়ে থাকার পর উঠে ধুতিটা ঝেড়ে-ঝুড়ে ভাল করে পরে নেয় সে। দু'তিনবার কাশে, তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকায়।

কিরণের নব্বই-পার-হওয়া দিদিমা উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। ছ'বছরের ছেলে চাত্তন উঠোনের অন্য এক পাশে একা একা নারকেলের ডালকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর বসে 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলছে। আর ঝাঁটা কাঠি দিয়ে সেই কাল্পনিক ঘোড়াকে চাবুক কষতে কষতে 'হেই হেই' করে চেঁচাচ্ছে।

বাড়ির সামনের সুদূরবিস্তৃত ক্ষেতের দিকে কিরণের পড়ে। ফসল তোলার পর ক্ষেতে আর অন্য কিছু কাজ শুরু করা হয়নি। ফসল ফলানোর মজুরী হিসাবে সে নিজে যা পেয়েছিল তার কাণাকড়িও এখন আর হাতে নেই। তিনদিন ধরে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি।

ঘরের ভেতর থেকে তার স্ত্রী খুব কাতরাচ্ছে। সে এখন পূর্ণগর্ভা, দু'এক দিনের মধ্যেই হয়তো সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। অথচ উনুনে হাঁড়ি চড়াবার জন্য সামান্য কিছু পয়সা পর্যন্ত তার হাতে নেই। কিরণ আবার ক্ষেতের দিকে তাকায়। ফাঁকা ক্ষেতের প্রতিফলন যেন তার মনেও লেগেছে। কোন কাজ বর্তমানে তার নেই, বাড়ি ছেড়ে চাকরির সন্ধানে বেশীদূর যেতেও পারে না।

ক্ষেতের দিকে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। ছোট খালটার কাছে গিয়ে থামে। ঝুঁকে পড়ে দু' আঁজলা জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। আঙুল দিয়ে দু'একবার দাঁতগুলো ঘষে কুলকুচো করে। তারপর ধুতির খুট দিয়ে মুখটা মুছে গাঁয়ের দিকে পা বাড়ায়।

রাস্তায় উঠে কিছুটা এগিয়ে যেতেই মানুষের একটা জটলা তার নজরে পড়ে। কিরণ এগিয়ে গিয়ে সেই ভীড়ের কাছে দাঁড়াতেই তার কানে এল রামন্নায়ার এবং আলন মাপ্পিলার কথাবার্তা।

'কি ব্যাপার রামন্নায়ার, কণ্ঠকুরুপের দোকানের সামনে এতো ভীড় কিসের ?'

'আমাদের চাপ্পুনীর যে কালো কুকুরটা আছে, সেটা পাগল হয়ে গেছে। কুকুরটা চার-পাঁচটা গরুকে কামড়েছে। আজ সকালে কেলুর ছেলেকেও কামড়েছে। তাই কেলু ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে মুঁসিক সাহেবের সার্টিফিকেট চাইতে এসেছে।'

'মুঁসিকের সার্টিফিকেটের কি দরকার ?'

'পাগলা কুকুরে কামড়ানোর হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক দিন চার পাঁচ আনা করে পাওয়া যাবে তার সার্টিফিকেট থাকলে।'

আলন মাপ্পিলা সেই ভীড়ের ভেতর ঢুকে পড়ে। কেলু নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। সে সকরুণ ভাবে তাকাচ্ছে সকলের দিকে। যেন বুঝে উঠতে পারছে না এ অবস্থায় এখনই কি করা দরকার।

'আরে এই কেলু, মুঁসিক সাহেবের কাছে তাড়াতাড়ি যা না। এ সময় তিনি বাড়িতেই থাকেন।' তরকারির ঝুড়ি মাথায় চন্নু নামক লোকটি তাকে পরামর্শ দেয়।

ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে কেলু মুঁসিকের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ; লোকেরাও যে যার পথ দেখল।

সেখান থেকে আরও এগিয়ে কিরণ কারোপ্পনের চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছাল। পথের ধারেই এক কোণে বসে সে দোকানদারকে হাঁক দিল। 'কই হে, আধ কাপ চা দাও।'

মিনিট দশেক পরে দোকানদার এক গেলাস চা এনে কিরণের সামনে রেখে দিয়ে বলে—'চিনি-টিনি সব ঠিক আছে। আর কিছু চাইলে পাবে না, হ্যাঁ—।'

প্রথম প্রথম সে এক কাপ চা নিয়ে বলত 'চা গাঢ় হয়নি, একটু লিকার কড়া করে দাও', পর মুহূর্তেই শোনা যেত 'ও ভায়া এই একটু চিনিটিনি দাও।' চেয়ে চিন্তে চিনিও পেত। এইভাবে

আধ কাপ চা'কে পুরো এক কাপ বানিয়ে নেওয়ার কায়দা সে জানত। কিরণের সেই অভ্যাস সম্পর্কে দোকানদার ওয়াকিবহাল। কিন্তু আজকালকার এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে চিনি, চা বেশী করে পাওয়ার কায়দা কদ্দিনই বা আর চলে !

দোকানদারের এই সতর্কবাণী পেয়ে কিরণ একেবারে দমে যায়। দুই হাতে চায়ের গেলাস ধরে ফু দিতে দিতে চা খেতে থাকে। প্রত্যেক চুমুক চা খেয়ে কেন যেন সে মাথা নাড়ছে। সামান্য কিছুটা খাওয়ার পর গেলাস নিচে রেখে দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে সে ড্যাব ড্যাব করে শাল পাতার উপর সাজানো 'ইডলীর' দিকে তাকায়।

চায়ের সঙ্গে 'টা' না হলে যেন আর চলছে না। কিন্তু ট্যাঁক সঙ্গতিশূন্য ; কি যেন একটু ভেবে নিয়ে সে বলে, 'একটা ইড্‌লী দাও তো ভাই। আর হ্যাঁ, এই পয়সাটা কালকে দিয়ে দেব'খন'—শেষের কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরুল ঠিক 'ইতি গজ' পদ্ধতিতে।

'পয়সা ট্যাঁকে না থাকলে 'ইড্‌লী' না খাওয়াই ভালো।' কথা কটি বলেই দোকানদার চা বানাতে বানাতে অন্য এক ছোকরার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে ওঠে—'নে নে, চা খেয়ে তাড়াতাড়ি গেলাসটা খালি করে দে।'

কিরণের মুখটা হঠাৎ যেন লম্বা হয়ে গেল। গেলাসের সর্বশেষ বিন্দু নিঃশেষে টেনে নিয়ে গাঁট থেকে প্রয়োজনীয় ও পরিশিষ্ট পয়সা ক'টি বের করে গেলাসের কাছে রেখে দেয় সে। তারপর কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকে।

ঘণ্টা খানেক কেটে গেছে। ধোপা কেলুকে মুঁসিক সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরতে দেখে, যে কাজের জন্য সে গেছলো তার কতদূর কি হল জানার ঔৎসুক্য নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

'মুঁসিক সাহেবের সার্টিফিকেট পেয়েছ?' কিরণ শুধায়।

'হ্যাঁ পেয়েছি। এবার সোজা হাসপাতালে যেতে হবে।'

'কত পয়সা পাবে?' কিরণ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

'এই বড় জোড় ছ'আনা। ওরা তো বলেছে একুশটা ইন্‌জেকশন দিতে হবে।' কেলু যেতে যেতে বলে।

কিরণও চলে যায় সেই ফাঁকা বিস্তৃত ক্ষেতের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে। তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে একটি পাগলা কুকুর আর ছয় আনা পয়সা!

সারাদিন এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করে রাতে বাড়ি ফেরে কিরণ। সারাটা দিনে কারও পেটে এক মুঠো ভাত পড়েনি। কিরণের গর্ভবতী রুগ্না বউ আশ-পাশ থেকে শাকপাতা সংগ্রহ করে এনে ছেলের, নিজের আর বুড়ির পেটের জ্বালা কিছুটা মিটিয়েছে। সেই অপূর্ব বস্তুর খানিকটা তার জন্যও ছিল।

পরের দিন ভোরে দাওয়ায় শোয়ানো বাচ্চা ছেলে চাত্তনের আঁৎকে ওঠা কান্নায় আর 'পাগলা কুকুর' 'পাগলা কুকুর' বলে কিরণের অস্বাভাবিক চিৎকারে বাড়ির সকলে এবং প্রতিবেশীরা ধড়মড় করে জেগে ওঠে। ওদিকে কিরণ ততক্ষণে একটা বড় ছড়ি হাতে নিয়ে ঝোপজঙ্গলের চারপাশে কিছুটা যেন

পরিকল্পিত ব্যস্ততায় ছুটাছুটি করতে থাকে। আর বউ এদিকে রোরুদ্যমান ছেলেটাকে সামলাতে ব্যস্ত—আহা, বাছার পায়ের গোছে কয়েকটা দাঁত একেবারে আমূলে বসিয়ে দিয়েছে কুকুরটা?

স্ত্রীকে ছেলের পরিচর্যায় ব্যস্ত দেখে কিরণ এসে দাঁড়াল। অনাহারে কোটরগত চোখদুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। সমস্ত শরীর তার অবর্ণনীয় এক উত্তেজনায় কম্পমান। স্বামীর এই মূর্তিতে ভয়-বিমূঢ়া বউ তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। কিন্তু…কিন্তু তার স্বামীর ঠোঁটে যেন কয়েক বিন্দু রক্ত লেগে রয়েছে না! বউটি তার আনত দৃষ্টিকে আবার তার মুখের দিকে প্রসারিত করে, ঈষৎ চাপা গলায় বলে—'তোমার ঠোঁট কাটল কি করে—রক্ত পড়ছে যে!' এই কটি কথা যেন কিরণের উত্তেজনায় আরক্ত মুখকে এক মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে করে দিল। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিল। কাপড়ের একপ্রান্ত দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে নিয়ে সে বলল, 'ও কিছু নয়।' অভুক্ত শীর্ণ ছেলেটা যন্ত্রণায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে! ব্যাপারটা যে কি ঘটেছে তা সে আদৌ বুঝতে পারেনি।

কিরণের চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা সব ছুটে এসে জড়ো হল। কিরণ তাদের প্রত্যেককে ব্যথা ব্যাকুলতা-ভরা কণ্ঠে জানাল যে কিভাবে তার ঘুমন্ত ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে।

'কুকুরটার রং কালো। তার লেজটা গুটানো ছিল। মুখটা

হাঁ করা, আর জিভ দিয়ে লক্‌লক্‌ করে লালা পড়ছে'—কুকুরের বর্ণনা সে প্রত্যেককে শোনাল।

'আরে এ যে সেই পাগলা কুকুরটার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ঐ কুকুরটাই তো কাল কেলু ধোপার ছেলেটাকে কামড়েছিল।' দুধওয়ালা কাপ্পারণ কিরণের বর্ণনার সমর্থনে বলে।

'দেখ, এই কুকুরটাকে আর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, যেখানেই ওটা থাকুক, খুঁজে বের করে তাকে মেরে ফেলা উচিত।' চান্নু দারুণভাবে চটে গিয়ে বলে, 'হ্যাঁরে কিরণ, বল দিকি শালার কুকুরটা কোন্ দিকে গেছে?'

'আরে, আমি কি আর অতো খেয়াল করেছি! কি জানি ঐ শয়তানের বাচ্চাটা কোন্ দিক গেছে!'

সেইদিন ভোরে মুঁসিক সাহেব ঘুম থেকে উঠে দেখলেন উঠোনে একজন লোক তার ছেলেকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুঁসিক সাহেবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিরণ ছেলেটার পায়ে চিমটি কেটে বিড়বিড়িয়ে বলে ওঠে, 'ব্যাটাচ্ছেলে কাঁদ্ না!'

চাত্তন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করে।

'কি চাসরে?' মুঁসিক সাহেব আমলাতান্ত্রিক ভাব নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'হুজুর, আমার এই বাচ্চা ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে।' বলেই কিরণ গামছা দিয়ে চোখ মুছে কান্নার ভাব দেখায়।

'কুকুরটাকে মেরে ফেলেছিস?'

'না বাবু, কুকুরটা কামড়েই পালিয়ে গেছে।'

'গাধা কোথাকার! আর তুই হাত গুটিয়ে বসেছিলি? বল্ কোন কুকুরটা কামড়েছে?'

'আজ্ঞে, সেই চাপ্পুনি নায়ারের কালো কুকুরটা।'

'কালকে যেটা ধোপার ছেলেকে কামড়েছে সেটা নাকি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু।'

'তোরা সব মানুষ না জানোয়ার! এত লোক থাকতে গাঁয়ের দু'দুটো ছেলেকে কামড়ে কুকুরটা চলে গেল! আর তোরা বসে বসে আকাশের তারা গুণছিলি?...তা এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কি চাস?'

'আজ্ঞে,...আজ্ঞে...সার্টিফিকেটটা...'

মুঁসিক সাহেব একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন—কিরণের ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে বলে।

চাত্তনকে কাঁধে তুলে নিয়ে তখনই কিরণ হাসপাতালের দিকে চলে যায়।

ডাক্তার এসে বড় এক ইনজেকশন দেয় চাত্তনের পেটে। ছেলেটি হাত-পা ছুঁড়ে খুব জোরে কাঁদতে চেষ্টা করে। কিরণ তার হাত-পা খুব জোরে চেপে ধরে থাকে।

খুব খুশীমনে সে বাড়ি ফেরে। মাথায় গামছায় এক সের চাল বাঁধা পুটুলি। হাতে দশ পনেরোটা কলা আর একটি মাছ। কাঁধে-বসা ছেলেটি নেতিয়ে পড়েছে। হাসপাতাল থেকে যে পয়সা পেল তার থেকে মাত্র চার পয়সা খরচ করে কিরণ তাড়ির দোকানে।

চার পাঁচটা ইন্‌জেকশন নিতে না নিতে ছেলেটির গা অনেকক্ষণ-জলে-ডুবে-মরা মানুষের মত ফুলে যায়। চলতে ফিরতে পারে না। কিন্তু তবু কিরণ ইন্‌জেকশন দেওয়ানো বন্ধ করেনি। প্রত্যেকদিন ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে যেত হাসপাতালে। পথে যার সঙ্গে দেখা হত তাকেই বলত, 'ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। মুঁসিক সাহেব সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ইন্‌জেকশন দেবার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছি।'

সপ্তম দিনে ছেলেটার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক দেখায় — 'বাবা, আজ আমাকে ছুঁচ ফোঁটাতে নিয়ে যেওনা। না, না, আমি যাব না।' ছেলেটা প্রত্যেকদিন বাবাকে এই অনুরোধ করত। কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে টেনে হিঁচড়ে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে কিরণ এগিয়ে যেত হাসপাতালের দিকে।

এগারোটি ইনজেকশন দেওয়ার পর ছেলেটির গা আরও ফুলে যায়। নাক মুখ সমান দেখায়। চোখগুলোকে যেন চারদিক থেকে মাংসের পুটুলি এসে চেপে ধরেছে। গায়ের রং সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বীভৎস দেখাচ্ছে তার মুখ। ঐ অবস্থায় ডাক্তার ইন্‌জেকশন দেওয়া আপাততঃ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন।

'দিন কয়েক ছেলেটাকে আর আনবে না, আর তোমাকেও আসতে হবে না।' ডাক্তার কিরণকে হুকুম দেন।

হঠাৎ কিরণের মুখটা যেন সমস্ত আশা হারিয়ে ম্লান হয়ে ওঠে। ছেলেটাকে টেনে পিঠে চাপিয়ে নেয় সে। ফুলে ফেঁপে

ওঠা ছেলেটার ভারে সামনে ঝুঁকে কিরণ জোরে জোরে হেঁটে নিজের বাড়ির দিকে ফেরে।

পরদিন ভোরে কিরণ দেখে তার চাত্তন অজ্ঞান হয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ে পড়ে আছে। একটা ক্ষীণ শব্দ কান পেতে যেন সে শুনতে পায়।

'খোকা, খোকা, খোকা চাত্তন!' —কিরণ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বারে বারে ডাকতে থাকে। নেড়ে চেড়ে দেখে। ছেলেটি নড়ে না।

কিছুক্ষণ পর আবার সাড়া পাবার চেষ্টা করে। চাত্তনের বুকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। সেই ক্ষীণ শব্দটা থেমে গেছে। কান্নায় ফেটে পড়ে কিরণ 'খোকা, খোকা' বলে ওকে ডাকে। খোকা কিন্তু আর সাড়া দেয় না। চিৎকার করে বউকে ডাকে কিরণ।

ওদিকে ঘরের ভেতর থেকে নবজাত শিশুর কান্না তার সে ডাকে সাড়া দেয়।

কান্না শোনার পর ক্ষ্যাপা কুকুরের মত নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এসে অপলক দৃষ্টিতে নিস্পন্দ মৃত চাত্তনের দিকে চেয়ে দেখে, নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ও ঘরের দিকে সে এগোবে কোন্ মুখে? কোন সাহসে?

●

পিওন

এম্‌. গোবিন্দন্‌

'আরে ও আহমদ, তোমার নামে যে বেশ কিছু টাকা এসেছে।'

'কত? ছেলে পাঠিয়েছে বুঝি!'

'এই তো দেখবে এবার। করকরে দশ টাকার নোট। নাও হে আর একটা বাক্স কিনে নাও। না হলে এত টাকা রাখবে কোথায়?'

'বললে তো ভায়া, জান না তো আমার হাঁড়ির খবর, তাই ওসব কথা বলছ। যেটুকু জমি আছে তাও বলদ নেই যে চষব। কি করে যে এক জোড়া বলদ কিনব সেই ভাবনায় মরছি।'

'আচ্ছা নাও, এখানে সই কর দেখি।'

'সই? হাসালে, আমি কি করে সই করব, তুমি তো জান ভায়া, আমি সই করতে পারি না। লেখাপড়া শিখিনি।'

'ছি, লজ্জা করে না, চুল-দাড়ি পাকতে চলল, সামান্য একটা সই করতে পার না! বুড়ো আঙুলটা দাও দেখি।'

আহমদের বুড়া আঙুলটা মনিঅর্ডার ফর্মে বসল।

'দেখ, আগামীবারে সই করতে না পারলে টাকা দেব না হ্যাঁ। সরকারের নতুন অর্ডার হয়েছে।'

'আমি কি করব, মুপ্পর ?'

'করবে আবার কি, লেখাপড়া একটু খেটেখুটে শিখে নাও।'

'এই বুড়ো বয়সে ?'

'সন্ধ্যের সময় প্রত্যেকদিন আমার ঘরে এসো, দেখা যাক এই বুড়ো বয়সেও শেখা যায় কি না।'

'আমি নিশ্চয় আসব মুপ্পর, আসব।........আরে এযে ভুলেই গেলে, এই নিয়ে যাও যাও...বকশিস্।'

'ওসব এখন থাক, পরে নেব'খন।'

'না না পরে আর মনে থাকবে না ; এখুনি নাও।'

মুপ্পর আহমদের দেওয়া বকশিস্ নিয়ে নিল। স্বভাবতই সরকার-দেওয়া মাইনের চাইতেও পরের দেওয়া বকশিসের উপরেই তাকে নির্ভর করতে হয় বেশী।

এইভাবে আমাদের গাঁয়ের এক ডাক-পিওন অনেক বুড়োকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আস্তে আস্তে আমাদের গাঁয়ে 'মাস্টার' বলেও পরিচিত হল। চাকরি যাওয়া পর্যন্ত তার সব কাজ শেষ হয়নি। তার মনের ইচ্ছা পূরণের আগেই অসুখে পড়ে গেল। যাহোক, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। পাঠাগার পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করার আগেই অসুখে পড়ে গেল।

জানালা দিয়ে কোচ্চি উঁকি মেরে দেখল। সেই বেচারী

বুড়িটা জাতিতে পুস্পাই।* চোয়ি মুপ্পরকে দেখতে এসেছে। তাকে দেখে বুড়িটার খুব দুঃখ হল।

'পারু, জানালাটা ভালো করে খোল তো, কে কোচ্চি না?' চোয়ি মুপ্পর জিজ্ঞাসা করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মুপ্পর, আমি কোচ্চি, ছেলেটাও সঙ্গে আছে।'

'কে? হাবিলদার? কোথায়?'

দুঃখ ও অভিমানের সঙ্গে বুড়ি ছেলেটাকে কাছে ডাকল। ছুটিতে তার ছেলে গাঁয়ে এসেছে। মুপ্পর অসুস্থ জেনে সে কিনে এনেছে—ভালো কম্বল, ওভালটিন, গ্লুকোস, দুধের কৌটা আরো কত কি!

কোচ্চির স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছিল অতীতের কয়েকটি ঘটনা।

'আমার ছেলের কোন খবর আছে মুপ্পর?' একবার রাস্তায় চোয়ি মুপ্পরকে জিজ্ঞেস করেছিল।

'কার, ল্যান্স নায়কের?'

'হ্যাঁ, সে এখন হাপিলদার?'

'আরে হাপিলদার নয়, হাবিলদার। বল, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাবিলদার। ছেলে কি চাকরি করছে তাও বলতে পার না। বল—বল—না বললে ছাড়ব না। বল হাবিল—'

'হাবিল'

'দার'

---

* কেরালার তথাকথিত একটি ছোট জাত।

'দার'

'হাবিলদার'

'হাবিলদার'

'ব্যস্, ঠিক আছে, নাও, এবার গুরুদক্ষিণা বার কর দিকি। —তোমার ছেলে বেশ হুঁশিয়ার। ঠিকমত টাকা পাঠায়। ভালো ছেলে। এবার বাড়ি এলে আমার বাড়িতে একবার নিয়ে এসো।'

'নিশ্চয়'

'পারু', রুগী নিজের মেয়েকে ডাকল, 'মাকে, আমার সেবা করাতে করাতে একেবারে মেরে ফেললাম!'

'বাবা, ও রকম করছ কেন বাবা, মেরে ফেললে—এসব কি কথা বাবা?' মেয়ের গলা শুকিয়ে এল।

'কেঁদো না মা, আমি এমনি বললাম। কই তোর ভাই দুটি কোথায়? কনারন আর মাধব গেল কোথায়?'

'বাইরেই আছে বাবা।'

'এদিকে ডাক তো মা।'

বোন দুই ভাইকে ডেকে আনল। তিনজনই বাবার শয্যার কাছে দাঁড়ায়। বাবা নিজের তিন ছেলে মেয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আমি একটু বসতে চাই মা।'

তিনজনে ধরাধরি করে বসাল।

মেয়ে পারুর দিকে তাকালেই মুপ্পরের মনে পড়ে তার স্ত্রী

লক্ষ্মীর কথা। পারু যেন ঠিক তার মায়েরই রূপ পেয়েছে। সেই হাসি, সেই দাঁত, সেই বিনম্রতা, সব যেন তার মা লক্ষ্মীরই। হুবহু মায়ের মতন। মুপ্পরের আজও মনে আছে—মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে লক্ষ্মী মুপ্পরের হাতে পারুকে সঁপে দিয়ে গেছে।······আর তো কোন চিন্তা নেই। কেননা পারু সেয়ানা হয়ে গেছে। কনারন আর মাধব, তারাও আজ নিজেদের পেট নিজেরা খেটেখুটে চালিয়ে নিতে পারবে।

কাশি আরও বাড়তে লাগল।

একটু দম নিয়ে মুপ্পর বলল, 'তোমরা তিনজন মিলেমিশে থেকো।···পারু, তুমি গিয়ে আমার বাক্সটা নিয়ে এসো মা।' মুপ্পর বাক্স খুলে তিনটে বই বার করল। তিনটেই পুরনো বই। এক এক অংশ উই পোকায় কেটেছে। প্রত্যেকটা এক এক জনের হাতে রেখে দিল।

'দেখ এটা হচ্ছে তোর ঠাকুরদার সম্পত্তি। এটাই আমার চোখের মণি। এটা তোমাদেরও কাজে আসবে। কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে এগুলো খুলে পড়ো।······প্রায় তিরিশটি বছর ধরে আমি এ গাঁয়ে আছি'—চোয়ি মুপ্পর আস্তে আস্তে বলে—'তখন আমারও বয়স ছিল তিরিশ বছর।'

বেচারা একসঙ্গে কথা বলতে পারছিল না। মাঝে মাঝে সর্বনাশা কাশি কাবু করে ফেলছিল তাকে।

'এই চত্বরে কত লোককে কত চিঠি দিয়েছি। কত মনি-অর্ডার দিয়েছি। তার কোন হিসেব নেই।' কে যেন রুগীর গলা চেপে ধরল, কাশতে শুরু করল মুপ্পর।

'কত লোককে দিয়ে সই করিয়েছি···প্রথম প্রথম তারা দিল বুড়া আঙুলের টিপসই। কত লোককে মনিঅর্ডার দিয়েছি, কিন্তু···আজও আমি···আমি কোন···মনিঅর্ডার···পা···পাইনি।'

কথাটা বেচারা শেষ করতে পারল না। হাঁপাতে লাগল। মৃত্যুর করাল ছায়া আস্তে আস্তে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই ঘরের বারান্দায় এক নতুন লোক এসে বললে—'চোয়ি মুপ্পরের নামে চিঠি আর মনিঅর্ডার এসেছে।'

চোয়ি মুপ্পর বড় বড় চোখ করে হাঁপাতে হাঁপাতে তাকাল। বারান্দার দিকে। কাঁপতে কাঁপতে হাত পাতল। মনিঅর্ডার ফর্মে কয়েকটি আঁকাবাঁকা রেখা পড়ল। মেয়েকে চিঠি খুলতে ইশারা করল। মেয়ে চিঠি খুলে ধরে বাবার চোখের সামনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ চোয়ি মুপ্পরের চোখের কোণে জল দেখা দেয়। তার পরক্ষণেই ঘাড় কাত হয়ে যায় শেষবারের মত।

প্রতীক্ষা

কে. সরস্বতী আম্মা

দীর্ঘদিন সেবা করার পর আজ যুবকটিকে সত্যি সুস্থ করে তুলেছে সেই হাসপাতালেরই নার্স, রীনি। তাকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে 'আর কিছুদূর আপনার সঙ্গে আছি।'

যুবক প্রশ্ন করে, 'তাহলে দাঁড়াও। প্রথমে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি কি নিজের সারাটি জীবন এই রুগীদের সেবা শুশ্রূষার মধ্যেই কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছ?'

'বাবার তো সেইটাই ইচ্ছা।'

যুবকের মন আর্তনাদ করে উঠে। 'বাবার নয়, মেয়ের ইচ্ছা জানতে চাই।'

রীনির কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে উঠল, 'আমি রুগীদের প্রশ্নের জবাব দিতে আসি নি, আমি এসেছি রুগীদের সেবা করে রোগ সারাতে। আমি নার্স, আমার জীবনের ব্রত সেবা করা, বুঝলেন!'

যুবক ভাবাবেগে রীনির দুইহাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'রীনি আমি হাসপাতাল ছেড়ে আজ যাচ্ছি। যাওয়ার আগে একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। কথা দাও সঠিক উত্তর দেবে। তোমার মনে কি আমার জন্য………'

রীনি যুবকের দিকে তাকিয়ে যেন তার মনের ছবিটি তুলে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গুরুগম্ভীর গলায়

বলল, 'আপনি যে ভালবাসার কথা বলছেন তা আমার এ হাত দুটোকে দুর্বল করে দেবে। কর্তব্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।'

'রীনি! এক তরুণীর মন নিয়েই কি এক তরুণকে এই সব কথা বলছ।'

'তার মানে?'

'এক তরুণীর মন………।'

রীনি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'এক তরুণীর মন নিয়েই তো কাজ করে যাচ্ছি।' যুবক পরাজিত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইল।

গোধূলি বেলা। কৃষকেরা লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে ফিরছে। তাদের যাওয়ার পথের পাশে একটি কুঁড়ে ঘর পড়ে। যুবক সেই কুঁড়ে ঘরের উঠানের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলে, 'ওদিকে তাকাও রীনি….দেখছো তো?'

রীনি দেখল, উঠানে বসে এক মা তার কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তারপর বলে 'দেখ গর্ভধারণ করে একটি বাচ্চা প্রসব করাই বড় কথা নয়।' তারপর আরো কঠোর কণ্ঠে বলে, 'এই সব দৃশ্য দেখিয়ে আমাকে নিজের ব্রত থেকে চ্যুত করার চেষ্টা করবেন না। আপনার সে প্রয়াস ব্যর্থ হবে বলে দিচ্ছি।'

যুবক নিশ্চুপ রইল।

রীনিও সংযত হল, কিছুক্ষণ পর শান্ত কণ্ঠে বলে, 'এর চেয়ে বেশী আমি অগ্রসর হতে পারব না। এর পরের কাজ নির্ভর করে আপনার উপরে।' যুবকের মুখ পাংশুটে হয়ে গেল।

শূন্যের দিকে মুখ তুলে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠে, 'ভবিষ্যতে কি কোনদিন এখানে এসে দেখা করার সুযোগ পাব না ?'

একটি যুবকের কাতর নিবেদনে রীনি যেন দুটি কথা না বলে পারল না। 'ঠিক আছে, আপনি আগামী বছর ঠিক এই দিনে আসবেন, বাবাতে আমাতে আপনার প্রতীক্ষায় থাকব।'

রীনি ফিরে গেল হাসপাতালে। যুবক নীরবে গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেল বিপরীত দিকে।

পঞ্জিকার বুক থেকে তিনশো পঁয়ষট্টিটি পাতা উড়ে পড়ল মহাকালের বুকে।

পুরনো স্মৃতি যুবকের মাথায় তোলপাড় করে উঠল। রীনি তার বাবাকে নিয়ে প্রতীক্ষা করবে। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। রীনিকে দেখার এত আশা এত আকাঙ্ক্ষা মনে তোলপাড় করা সত্ত্বেও কোন অজানা কারণে সে যেন এগুতে চায় না। মনের সে আবেগে কোথায় যেন একটা জগদ্দল পাথর পড়ে আছে।......

রীনির বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল যুবক। দরজায় কালো পর্দা টাঙানো। সমস্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটা সকরুণ আর্তনাদ বিদ্যমান।

ভিতরে ডাক্তার বসে আছে মাথা নিচু করে। যুবককে দেখে একবার হাসল। যুবকের সারা শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল। সারাটি ঘরে একটা নীরব নিস্তব্ধ কঠিন ভাব।

ডাক্তার যুবককে পাশে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করেন। হাজার প্রশ্ন, লক্ষ আতঙ্ক মনকে দুম্‌ড়ে মুচড়ে ফেলে। অনেক কষ্টে যুবক প্রশ্ন করে, 'রীনি কোথায় ?'

'রীনি !' ডাক্তার চমকে উঠে।

'হ্যাঁ, রীনি।'

'আজ সকাল পর্যন্ত সে তোমার প্রতীক্ষায় ছিল। আর কিছুক্ষণ আগে এলে হয়তো দেখা পেতে······কিন্তু—।'

ডাক্তার উদাসভাবে হেসে বলে, 'তুমিই আজকে তাকে বিদায় করতে—কিন্তু সে সুযোগ আর সে তোমাকে দিল না।' কিছুক্ষণ নীরবতার পরে আবার বলে 'তুমি জান শেষবারের মত চোখ বোজার আগেও সে তাকিয়েছে তোমার আসার পথের দিকে—এই দরজার দিকে তোমার প্রতীক্ষায়।'

যুবকের চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল টপ্‌টপ্‌ করে নিচে পড়ে। ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'রীনির শবদেহ কি দেখতে পাব ?'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে, 'না। রীনির ইচ্ছা তার শবদেহ যেন কেউ না দেখে। তাছাড়া তার দরকারই বা কি ! রীনি আমার বেঁচে থাকবে হাজার লোকের মধ্যে সেবার প্রতীক হয়ে।' ডাক্তারের মুখে আর কথা সরল না।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কখন ফিরে যেতে চাও ?'

যুবক দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি রীনির শ্মশান-যাত্রায় সামিল হতে চাই।'

'শবযাত্রা তো বেরুবে সন্ধ্যা চারটায়'।

'আপনিও যাবেন তো ?'

'না !' ডাক্তার দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'একজন রুগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাকে দেখাশুনা না করে রীনির শবযাত্রার সঙ্গে গেলে তাতে তার আত্মা দুঃখ পাবে। সেবাই ছিল রীনির জীবনের একমাত্র ব্রত।'

যুবক সজল চোখে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে যায়।

চেতনা

মলৈয়াট্টুর রামকৃষ্ণন

ভোর হতেই বাস থেকে নামি আমরা। সূর্যের আভা গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ছে গায়ে, মাটিতে, সর্বত্র। পাশাপাশি ছায়ার দীর্ঘ রেখা। গ্রাম ঘুমিয়ে আছে তখনও। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে শুধু খোলা একটি চা-দোকান। আমরা দুজনে, কামাত এবং আমি, দোকানে বসি। চা খাই। খাবার চাইলে মাথা নেড়ে দোকানদার জানিয়ে দেয়, নেই। নিরাশ হয়ে সিগারেট ধরিয়ে দু'টান মেরেছি, দোকানদার জিজ্ঞাসা করে 'নতুন এলেন বুঝি এই গাঁয়ে?'

অন্য কোন অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলে আমরা হয়তো তার এই কথায় একটু চটে যেতাম। কিন্তু এখন বিপাকে পড়েছি—যে বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, সে কসবা গাঁয়ের অদূরে থাকে। এইটুকুই জানি। সঠিক ঠিকানা কেউ বলে দিলে মন্দ হত না। হয়তো দোকানদার বন্ধুটিকে চিনতে পারে। তাই বলি, 'হ্যাঁ নতুন এসেছি। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।'

'আপনার বন্ধু? কি নাম?'

'বর্মা বাবু।'

'কোন বর্মা বাবু, ঐ যে যার নাম প্রায়ই পেপারে দেখি তিনি নাকি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তিনি' দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, যেন বিরাট এক সাহায্য পেয়ে গেছি !

'আরে আমরা দুজনে তো একে অন্যকে খুব চিনি। কালকেই আমার এখানে অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি।' দোকানদার এমনভাবে হেসে বলল যে একটি দাঁতও আমাদের নজরে পড়তে বাকী রইল না।

কামাত সম্ভবত আশঙ্কা করেছিল, লোকটা লম্বা-চওড়া ভূমিকার অবতারণা করবে। তাই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা দয়া করে বলে দিন না কোন পথে গেলে আমরা সহজে তার বাড়ি পৌঁছে যাব।'

দোকানদার আমাদের পথের নিশানা দিয়ে দিল। আমরাও তার ভূমিকা শুরু করার আগেই নিজেদের যাত্রা শুরু করে দিলাম।

বেশ কয়েক বছর আগে বর্মা বাবু আমাকে তাঁর গাঁয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। আর আমি কিনা আজ অবসর পেলাম আসার ! তার উপর ইচ্ছা করল, খবর না দিয়েই আসতে। ভাবলাম, খবর না দিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবেন তিনি।

পাকা পথ থেকে নাবলাম ধুলোমাটি আর এবড়োথেবড়ো পথে। সে পথের দু'পাশেই লম্বা লম্বা নারকেল গাছ। নারকেল গাছের কোল ঘেঁষে যাওয়া মাটির ড্রেনে পড়া নারকেল আর পাতা পচে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সে গন্ধ সহ্য করা আমাদের পক্ষে

একেবারে দুঃসহ। অথচ তা দিয়েই দড়ি পাকিয়ে আমাদের দেশের হাজারো পরিবার দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে! ধুলোতে ভরা পথ। পা ঢুকে যাচ্ছে ধুলোতে। অন্ধকার আস্তে আস্তে যেন পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কুঁড়ে ঘরগুলো যেন জাগছে। যেতে যেতে পৌঁছালাম এক ছোট নদীর তীরে। নদীর ওপারে বন্ধুর বাড়ি।

তীরে একটি নৌকা বাঁধা। কিন্তু মাঝির পাত্তা নেই। তাই গলা ফাটিয়ে হাঁকতে হল।

কাছেই তেল-কলের বারান্দায় এককোণে হাত-পা গুটিয়ে পুঁটলির মত পড়ে আছে লোকটা। হাঁক দিতেই নড়েচড়ে উঠে এক দৌড়ে আসে আমাদের কাছে। জোয়ান মাঝি। কুচকুচে কালো গুলিভাটা চেহারা। মোটা ঠোঁট আর পাকানো চুল। কোকিলের মত লাল চোখ। এক চিলতে কাপড় আছে কোমরে। কালো শরীরে সর্পিল স্ফীত শিরাগুলি কিলবিল করছে।

নৌকায় পা রাখতেই আমার বুক খুব জোরে ধড়ফড় করে ওঠে। বছর কয়েক আগে এই গাঁয়েই এক ভীষণ সংঘর্ষ হয় বীর মজুরদের অদম্য শ্রেণীচেতনা আর সশস্ত্র ফৌজের দানব শক্তির মধ্যে। বীর নিরস্ত্র মজুররা নিরাশ হয়নি। বাঁশের কেল্লা তুলে লাঠির আঘাতে সদর্পে এগিয়ে সে দানব-শক্তিকে দূর করে ছয়দিন সেখানে নিজেদের রাজ কায়েম রাখে। ফৌজ তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দমনের সবরকম

হীন চেষ্টা চলে। হাজারো মজুর হতাহত হয়। শত শত লোককে ভূষির মত পুড়িয়ে ফেলা হয়।……আমার শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। আমি আজ সেই ভয়ঙ্কর গ্রামেই যাচ্ছি। সে গাঁয়ের পথগুলো যেন আজও রক্তে ভেজা। রক্তের নোন্‌তা গন্ধ যেন ফুটে বেরুচ্ছে আজও। এরক্ত শ্রমিকদের, যাদের তুনিয়ার কোন শক্তিই মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিতে পারেনি।

নৌকো চলেছে। মাঝপথে কামাত মাঝিকে এমনি জিজ্ঞেস করে বসে, 'সংঘর্ষের সময় তুমি কি এখানেই ছিলে?'

সম্ভবত লোকটা এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আমাদের দিকে ঘুরে ফিরে দেখে কয়েকবার। তারপর আকাশের দিকে তাকায়। হয়তো তার মনে স্মৃতির মেঘরাশি এসে জড়ো হচ্ছে।

'হ্যাঁ, আমার বাবা তাতেই মারা গেছে!'

কামাতের চোখ ঐ শহীদের সন্তানের উপর নিবদ্ধ হয়।

'এ নৌকোটা আমার বাবারই।'

তু'তিন মিনিট সবাই নিশ্চুপ। ততক্ষণ নৌকোটা তীরে এসে পৌঁছাল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু পয়সা বার করে দিতে যাই মাঝিকে।

'না, না'—মাঝি নিতে চায় না।

'নাও না ভাই।'

'না, আপনারা আমাদের গাঁ দেখতে এসেছেন। আমি ভাড়া নেব না।' হাসতে হাসতে বলে।

সেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর এগোয়। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করে, 'ঐ নারকেল গাছগুলো দেখছেন?'

আমরা গাছের গায়ে দেখি সব গর্ত।

সে বলে 'ওগুলো হচ্ছে গুলির দাগ।'

ঐ শহীদ গাছগুলোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে আমরা অগ্রসর হই। চলার পথে বালির একটা পাহাড় নজরে পড়ে।

'এখানেই সেই সব শহীদদের পুঁতে দিয়েছে।' মাঝি বলে।

বীরদের সেই সমাধি দেখে আমার মনে অনেক রকমের চিন্তা-ভাবনা তোলপাড় করতে লাগল। আমাদের মাঝি যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক দূর যেতে আর সেখানকার প্রত্যেকটি ঘটনার ইতিহাস বলতে প্রস্তুত। কিন্তু বাধা পড়ল হঠাৎ এক মাঝবয়সী লোক এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। আমরা নিজেরাই এগোতে লাগলাম।

ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে গাছ-গাছড়া ঝোপজঙ্গল। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের চালা মাটি ছুঁয়েছে। কুঁড়ে ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ন্যাংটা, আধ নেংটা ছেলেমেয়ে। পাঁজরা গোনা যায়। পিলে-রুগীর মত পেট বড় হয়েছে। সাত আট বছরের ছেলেরা যেন বুড়োদের মত নেতিয়ে পড়েছে।

'আকাল!' হঠাৎ কামাত বলে ওঠে। যেন সে একটা গভীর ব্যাপার চিন্তা করছে!

আমার মনে সে সংঘর্ষের কথাই তোলপাড় করছিল। সে এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ। গরীব লোক যোগ দিয়েছে তাতে। তারা

নারকেল দড়ি পাকায়। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তাদের। ওরা সমাজে সবচেয়ে বেশী আলো দেয়। পিলসুজ মাথায় করে থাকে। তারা আলো পায় না। অন্ধকার তাদের ঘিরে রাখে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে। তারা সেদিন অন্ধকারের সে চক্র থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারা জানে তাদের হারাবার আর কিছু নেই। পাওয়ার আছে জগতের অনেক কিছু। তাই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল সেদিন। দানব-শক্তি দিয়েছে মরণ-কামড়। এইখানে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে বন্দুক আর স্টেনগান নিয়ে। চারিদিকে জল। কোথাও আত্মরক্ষার স্থান নেই।

'আরে তুমি কি পাগল হয়েছ। সেটা কি আর পালানোর লড়াই ছিল।' কামাত হঠাৎ বলে ওঠে।

তখন আমি জানতে পারি যে ভাবতে ভাবতে আমার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে পড়ছে কোন ফাঁকে।

সত্যি তাই। কেউ পালায়নি সে লড়ায়ের ময়দান থেকে। মেশিনগানের গড়গড় শব্দকে তারা উড়িয়ে দিয়েছিল আকাশ-ভেদী সম্মিলিত স্লোগানে। তারা তাদের পদক্ষেপ ফেলেছে একমাত্র সামনেই। গুলি তাদের বুকে বিঁধেছে। এফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। অনেকের জীবনকে নষ্ট করেছে। কিন্তু পারেনি তাদের মন থেকে শ্রেণী-চেতনাকে মুছে দিতে!

সেই সংঘর্ষের উপর রচিত গানের দু'চার কলি আমি মনে মনে গুনগুন করে গাই—

'সূর্যের সন্তান রাত্রির কাছে ধরা দেয় না।
আমরা পৃথিবীকে সুন্দর করব···আমরা মৃত্যুকে আর ভয় করি না।"

শেষ পর্যন্ত আমরা বর্মা মশায়ের বাড়িতে পৌঁছালাম। যা ভেবেছি তাই, আমাদের দেখে তিনি তো একেবারে অবাক।

তারপর সাত-পাঁচ কথা হল। বর্মা মশায়ের স্নেহময়ী মা আমাদের পেটভরে খাওয়ালেন। কথায় কথায় আমরা সেই সংঘর্ষের কথায় এসে পড়ি।

বর্মা শোনালেন সে কাহিনী।···বেকারীর কথাবার্তা, ভাত না পাওয়াদের কান্নার কথা। আধ-মরাদের জটলা পাকিয়ে জীবনের দায়ে লড়াইয়ের সে অপূর্ব গাথা।

'প্রত্যেক পরিবারে খোঁজ করলে কম-সে-কম একজন জীবন দিয়েছে সে লড়াইয়ে। আপনারা আসার পথে যে পুকুর দেখেছেন তার জল মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেছল। মানুষের মাংস সারা পুকুরে কচুরী পানার মত অনেকদিন ভেসেছিল। গন্ধ সহ্য না হলে মিলিটারীর লোক তা বের করে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। আসার পথে আপনারা হয়তো একটা বালির পাহাড় দেখেছেন!'

হঠাৎ বর্মা মশায় কথা বলতে বন্ধ করে বাইরের দিকে তাকালেন। একজন আসছিলেন সেদিকে। চুলদাড়ী পাকা। শরীরের হাড়গুলো বেশ মোটাসোটা। কানে লাল লাল বালা।

বর্মা মশায় আমাদের ধীর কণ্ঠে বললেন, 'ঐ যে বুড়ো

ভদ্রলোক আসছেন, সংঘর্ষের সময় পুলিসে কাজ করতেন। এখন তিনি একজন অন্যতম বিপ্লবী!—আসুন, আসুন'— বর্মা মশায় খুব আবেগে ডাক দিলেন।

বুড়ো ভদ্রলোক এলেন আমাদের কাছে। যেন ডুব দিয়ে এসেছেন মানুষ-ডোবা পাঁক থেকে। দলা দলা পাঁক গড়িয়ে ঝুলে পড়ছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু ওগুলি পাঁক নয়। গায়ের মাংস আর চামড়া। চোখ দুটি গলা গলা, একটু সাদাটে। এসে থপ করে বসলেন আমাদের পাশে।

'আমরা সেই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের কথা বলাবলি করছিলাম', কামাত বলে উঠে।

'হুঁ, সেই লড়াইয়ের কথা', বলে তিনি আমাদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমরা সে বিষয়ে তেমন কিছু জানি না।

'আপনি তো সে সময় পুলিসে কাজ করতেন। আপনি নিশ্চয় স্বচক্ষে সব ঘটনা দেখেছেন।' আমি তাঁকে এমনভাবে বলি যাতে তিনি আমাদের সে সম্পর্কে কিছু জানান।

'সে সময়কার কথাই ছিল আলাদা', তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, 'আমি স্পেশাল ডিউটিতে এসেছি।…… ওঃ! সে কি জটলা, কি ভীড় আর হাঙ্গামা! অগ্নিবর্ষণ চলেছে।… …ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন ছড়িয়ে পড়তে, পালাতে সব জনতাকে। একটি লোকও পিছু হটেনি। এক পা'ও না। কেউ সে হুকুম তামিল করেনি। আরে ভাই, আমি আর কি করতে পারি! কি লড়ুইয়ে লোক তারা! তারপর ক্যাপ্টেন সরাসরি মানুষের

উপর গুলি চালাতে হুকুম দিলেন। বাইশ বছরের এক নওজোয়ান বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বলল—চালাও গুলি। ······ছ মিনিট।······তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মুঠো তুলে আমাদের এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়ে চোখ বুজল।

'কত লোককে মেরে ফেলল। কতলোক তাদের বন্দুকের শিকার হল। তবুও স্লোগান চলছে। অবশেষে মরিয়া হয়ে গাঁ-কে-গাঁ পুড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন—স্বাধীন ভারতে দেশদ্রোহীদের আর রাখা হবে না। ক্যাপ্টেনের দৃপ্ত ঘোষণা। আরো বেশী গুলি চলল। জ্বলল আগুন, অনেকের সর্বাঙ্গে ভয়াবহ ক্ষত। ভুরুর চুল সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে কারো বা। মুখ আর হাতের চামড়া পুড়ে গিয়ে ফালি হয়ে ঝুলছে কারো।

'পরের দিন সকাল। সূর্য উঠছে। শেয়ালেরা আনাগোনা করছে। মুখে করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দগ্‌দগে মাংস। শকুনেরা সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।······

'বেরিয়েছি। দেখতে বেরিয়েছি আগের দিনের বর্বরতাকে কতদূর নাবাতে পেরেছি তা দেখার পাশবিক আনন্দে।

'—মাটিতে দেখি একটি মহিলা। বুকে এক আঁজলা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। একটি হাত বাড়ানো। যেন কিছু ধরতে চায়। অদূরেই দেখি একটি শিশু মরে পড়ে আছে। তার মাথার খুলিটা আড়াআড়ি হয়ে খুলে পড়ে আছে। মাথার ভেতরটা তরমুজের মত লাল। রক্তের একটা দীর্ঘ রেখা এঁকে সে যেন এগোচ্ছিল!

'মনটা দুমড়ে মুচড়ে গেল। বাচ্চাটার উপর হাত বুলোতে চেষ্টা করতেই গায়ের এক অংশের চামড়া আমার আঙুলে আটকে গেল, বেরিয়ে এল! আর দেখা গেল তলাকার দগ্‌দগে মাংস।

'গাঁয়ে বিশেষ কেউ নেই। দেশদ্রোহীরা নাকি সব মরেনি। পরোয়ানা বেরুল তাদের নামে। চারদিকে খোঁজ পড়ল। তাদের অপরাধ তারা রুটি চায়, রুজি চায়, চায় মাথা গোঁজার স্থান। এই দাবিতেই তারা একজোট। লোকগুলো মরে তবু পেছোয় না। কি শ্রেণী-চেতনা!

'অন্যদিন একটি ছেলে আমাদের জালে পড়ে যায়। আমরা তখন দেশদ্রোহীদের খুঁজছি সাদা পোশাকে। পড়ে গেছে জালে। ছেলেটা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে-থাকা লোকদের যোগাযোগ করে তলে তলে। ইন্সপেক্টর লোভ দেখাল। কোন ফল হল না। একটি কথা বের করা গেল না তার কচি মুখ থেকে। তার পরেই চলল ঘুষি, লাথি, বুকে বুটের আঘাত। পাঁজরগুলো কড়মড় করে উঠল। আরো কিল, ঘুষি, লাথি চলতে থাকে। চুল ধরে দাঁড় করায়, মুখ থ্যাবড়া হয়ে গেছে। রক্ত গলগল করে গড়াচ্ছে তার ঠোঁটের কোণ দিয়ে।......তবু আশ্চর্য! একটি কথা যদি তার মুখ দিয়ে বের করা যায়! সে কি শ্রেণী-চেতনা!...... প্রায় এক হপ্তা পরে হঠাৎ সে ছেলেটি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চায় আধমরা অবস্থায়। ইন্সপেক্টর আসার পর বলে—আমি আপনাদের পয়লা নম্বরের দুশমন কুমারনের ঠিকানা

বাৎলে দেব চলুন! সেকি! আমি আশ্চর্য হয়ে গেছলাম। কোথায় গেল সে শ্রেণী-চেতনা! যাক, আমারই উপর আবার পড়ল কুমারনকে অ্যারেস্ট করে আনার। তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি কুমারনের সন্ধানে।

'এদ্দিন তোর এ বুদ্ধি কোথায় ছিল? নিজের শরীর এভাবে নষ্ট করে কি লাভ হল তোর। বলারই যখন ছিল গোড়াতেই বলে দিতিস।

'তখন সে বলল, "এখন আমি বলতাম না, তবে এতক্ষণে কুমারন হয়তো মারা গেছে।"

'জিজ্ঞাসা করি, "হয়তো মারা গেছে মানে?" সে বলে, "তার পায়ে গুলি বিঁধে গেছলো। তখনও সেটা তোলানো গেল না। গেল না কোন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা। আমি তার খাবার প্রত্যেক দিন নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতাম। সে কোথায় আছে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

"এ'কদিন কিছুই তো খেতে পায় নি।" বলতে বলতে ছেলেটার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

'আমরা খুব জোর অগ্রসর হতে লাগলাম। শেষে এক নির্জন জায়গায় পৌঁছলাম। কাছাকাছি আবাদি জমির কোন চিহ্ন নেই। এক পুরনো হেলে-পড়া কুঁড়ে ঘর। ছেলেটা তার ভেতরে ঢুকল। আমিও তার পিছু ধরি।

'এক পুরাতন নারকেল দড়ির খাটিয়ায় একটা লোক নিশ্চল অবস্থায় পড়ে আছে। এ সেই কুমারন। মজুর-চাষীদের নিয়ে জোট বাঁধে। দেশদ্রোহী। আমার পায়ের পাশ দিয়ে এক

সারি পিঁপড়ে এগোচ্ছে। শেষ হয়ে গেছে—মুখে, চোখে, সারা শরীরে তার চিহ্ন।

'ছেলেটা হাতকড়াসহ বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। বুক ফাঁটা সে কান্না।

'বুলেটের সামনেও নুয়ে না পড়ার চেতনা। অপূর্ব শ্রেণী-চেতনা। স্বাভাবিক ভাবেই আমার মাথা নুয়ে গেল।'

বুড়ো লোকটি কথা শেষ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে আমাদের দিকে তাকায়। আমরা বোকার মত গুম হয়ে বসে থাকি।

●

ভালবাসার ও ত্যাগের সওয়াল

তোম্বিলা ভাসী

সেদিন রাত দুপুরে আমি আমার গোপন আস্তানায় ফিরে এসেছি। আমার খাওয়ার সময় সেবাড়ির গিন্নি বলে—কে যেন আমাকে নাকি দেখতে চায়।

কে দেখতে চায় জিজ্ঞাসা করতেই 'ঐ বাড়িরই একটি বউ' বলে পশ্চিম পাশের বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয়।

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ঐ বাড়ির বউ?' সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক কিছু বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমার মনে তখনও নানা সংশয় উঁকি মারতে থাকে, পাছে আমার গুপ্তজীবন ফাঁস হয়ে পড়ে।

ও বাড়ির বউ নাকি খুব বুদ্ধিমতী। সত্তবিবাহিতা সেই বউটি যৌতুক হিসাবে পাওয়া সম্পত্তি নিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। সে আমার সম্বন্ধে নাকি অনেক কিছুই জানে।

হতেও পারে। এটা ঠিক যে আমি ছিলাম একটি বড় ধরনের আসামী এবং মাননীয় সরকার বাহাদুর আমার সম্বন্ধে যখন তখন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া, তাদের প্রতি আমার তৎপরতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক গল্পও তাকে বলতে নাকি শুনেছে। সে নাকি আমাকে তার পড়া কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের নায়ক হিসাবেই ধরে বসে আছে।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদিও আমি অথবা আমার কোন বন্ধুও এতো দুঃসাহসিক কাজ কিছু করিনি, তবু সে আমাকে কোনদিন না দেখলেও আমার সম্বন্ধে আমার মায়ের চাইতেও তার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে আমাকে দেখতে চাওয়াতে নিতান্ত বোকা বনে গেলাম। বাড়ির গিন্নী বললেন, 'না, কোন বিপদ ঘটবে না।' আর কোন তর্কবিতর্কের অবতারণা না করে দেখা করতে রাজী হয়ে গেলাম।

গুপ্ত জীবনযাপনকারীর পক্ষে দেরীতে বিছানা ছেড়ে ওঠা একটা স্বাভাবিক রীতি। আমিও সেই রীতি ভাঙিনি। তবু সেদিন ঠেলায় পড়ে ভোর থাকতেই উঠতে হল। ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে মনটাকে একটু চাঙা করে নেবার জন্য এক কাপ চা খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলাম। ও বাড়ির সেই বউটি তারও এক ঘণ্টা আগে থেকে এসে কথা বলার জন্যে ঠায় বসে আছে। একাই এসেছে—সঙ্গে কোন বেটা-ছেলে নেই। আমাকে দেখামাত্র বউটি হেসে ফেলে। সহজ সরল হাসি। যদিও এ হাসি মুহূর্তের জন্য তবুও তার মনের আকাশে বিদ্যুতের মত এতো উজ্জ্বল আলোকপাত করেছিল যে মনের সামান্যতম কালো রেখাটি পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছল। এমন মনোরম হাসি, মুক্ত প্রাণের এমন অপূর্ব অভিব্যক্তি বোধ হয় বছর দুয়ের পূর্বের এক রক্তপতাকা সুশোভিত শোভাযাত্রায় ঘোরার সময় এক চাষী-কন্যার মুখে ছাড়া অন্য কোথাও দেখি নি। সে ছবি আমার মনে দাগ কেটে আছে।

আমি বললাম, 'এই আমিই, আসুন।' তারপর আমার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সে তার স্বামী, তার ঘরবাড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেল।

সরল স্বাস্থ্য, অপূর্ব সৌন্দর্যময় আদর্শ নারীত্বের এমন নিখুঁত সমন্বয় বিস্ময় লাগে।

বিকেলে স্বামীকে নিয়ে আবার দেখা করতে আসে। সেই নতুন দম্পতির সুমধুর ব্যবহারে তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে। তাদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে মশগুল হয়ে উঠলাম। ক্রমেই তাদের উপলব্ধি করতে পারলাম। তারা আমাকে নিমন্ত্রণ জানাল।

আমার কাছে গল্প শুনে সে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে ধূমায়িত এবং শোষিতের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় পূর্ণ করে নিত। ক্রমে ক্রমে ঐ দম্পতি এইভাবে আমাদের ঈপ্সিত সমাজ এবং আমাদের মূল লক্ষ্যে তাদের আস্থাকে দৃঢ়তর করতে লাগল। তারা যেন আমাদের দলের দিকে চুম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট হতে থাকে। পার্টির কল্যাণের চিন্তা যেন তাদের পেয়ে বসে।

এই রকম পরিবেশে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে থাকাকালীন এক রাত্রে পুলিস কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে এক টুকরা কাপড়বিহীন অবস্থায় কোন ক্রমে পালাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে যখন আবার তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম তখন তারা তাদের অফুরন্ত উচ্ছ্বাসে ভরা আনন্দে আমাকে সম্বর্ধিত করে। সম্বর্ধনার সেই আনন্দ-

মুখর দিনেও বউটির মুখ থেকে ঘুটঘুটে কালো মেঘ যেন সরে যায়নি। তারপরে তাকে দিয়েই আমার এক গোপন চিঠি পাঠাতে হল। পাঠানোর পরেই যেন দুশ্চিন্তা ঢুকল আমার মনে।

এমন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সূর্যের আকাশ পরিক্রমার পরিসমাপ্তি হলে চাঁদিনী রাতে প্রকৃতির স্বপ্নময় রাজ্যের আগমনী-সঙ্গীত অতি তুচ্ছতম সৃষ্টির মাঝেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এহেন স্বপ্নের রাজ্যের নাগরিকত্ব লাভের আকর্ষণ তৃণময় বিশাল ময়দানের দিকে টেনে নিতে চায় আমাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম, এমনি এক চাঁদিনী রাতের একফালি আকাশ দেখবার বাসনা নিয়ে কারারুদ্ধ কয়েদি আমি এক দারোয়ান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম, আর আজ কেমন করে আমার ভিতরের কোন প্রবল পরাক্রম দারোয়ানের ভ্রূকুটিমাত্রেই কেমন নিশ্চল পাথরের মত বিছানায় পড়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরেই জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি আঙিনায় দাঁড়িয়ে এক নারী মূর্তি। সেই নারী-মূর্তির ভিতর এমনি এক পবিত্রতা বিরাজ করছিল তার সন্ধান আরও একবার পেয়েছিলাম বহুদিন আগে-দেখা একটি মেয়ের সরল হাসির মধ্যে। সযত্নে কয়েকটি গোলাপফুল চয়ন করে আমাকে উপহার দিতেই ফুলের কমনীয়তার চাইতেও তার পাপড়ির মত আঙুলের কোমলতা আমাকে বেশী অভিভূত করে ফেলে। তার মুখের মলিনতার কারণ জিজ্ঞাসা করে আমার এক সহাস্য প্রশ্ন। কিন্তু তাতে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। অথচ চিঠিটি নাকি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

সে বউটি আমাকে যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু আমি সে কথা শুনতে চাই না এমন ভাব দেখাই। সে আজ একজনের বউ আমার সঙ্গে দশ বছর আগে কৃষক এলাকায় হয়তো ওর সঙ্গে আমার পরিচয়……

সে অনেকদিনের কথা আমাদের একজন কমরেড খুব ভাল ভাবে লোক চিনতে পারত। সুদূর সে অতীতে গাঁয়ের যে মেয়েকে আমি ভালবাসতাম—তাকে সে-ও প্রশংসা করেছিল। তাকে বিয়ে করলে নাকি পার্টির সম্পদ বাড়বে। আমারও সে ধারণা দৃঢ় ছিল। ঝালিয়ে নিলাম।

হয়তো তাকে আজ ঐ চিঠি দিয়ে সেখানে পাঠানো উচিত হয়নি। হয়তো সে ওখানে আমাকে আরো গভীরভাবে জানার মত মাল মশলা পেয়েছে। হয়তো সেই বউটিই আমার অতীতে সেই চাষীকন্যা, হয়তো আমার গুপ্তজীবন থাকাকালীন তার বাবা-মা জোর করে তাকে বেঁধে দিয়েছে অন্যের সঙ্গে। হয়তো তাই, হয়তো তা নয়।

দুদিনের আগের সে-হাসি বউটির মুখে নেই। তার হাসির শব্দে যেন বনের পাখিরা গান গেয়ে উঠত, কিন্তু আজ সে গা ধোয়নি, চুল বাঁধেনি, ম্লান মলিন মূর্তি ক্লান্ত-করুণ মুখ।

'পথে কোন বিপদ ঘটেনি তো? কেউ কি দেখে ফেলেছে?'

'না।'

'আচ্ছা, তাহলে আমি বেরোই, আজ থেকে আমাকে অন্য গাঁয়ে থাকতে হবে।'

হঠাৎ এক প্রশ্নে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়—

'আমি কি করব বলতে পার?'

হঠাৎ কে যেন হাজারো ছুঁচ বিঁধে দিল আমার মনে। ঝাপসা চোখের সামনে ছায়াবাজির মত অতীতের কত দৃশ্যাবলী ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বলি, 'সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যতটুকু পার পার্টিকে সাহায্য কর। অভিনন্দন।'